যোগের চতুরঙ্গ

এখন তোমাদিগকে যোগের যে অঙ্গচতুষ্টয় বা চারিটি সোপান সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার যোগ সন্ন্যাসীর যোগ নয়, আমি নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া আবার ইউরোপীয় অনুশীলন (culture) বাদীদিগের মত আমি মনে করি না যে শুধু প্রবৃত্তির চেষ্টার বলে প্রবৃত্তির উন্মেষণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টি করাই মানুষের চরম আদর্শ। নিবৃত্তি চাই কিন্তু সে নিবৃত্তি অন্তরে, প্রবৃত্তি চাই সে প্রবৃত্তি বাহিরের খেলার মধ্যে। পুরুষ নিবৃত্ত হইবে কিন্তু প্রকৃতি নিত্য নবরচনায় প্রবৃত্ত হইবে। পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে না—গীতা যেমন বলিয়াছে, 'বিমূঢ়' হইয়া পড়িবে না। আপনাকে সরাইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে প্রকৃতির হস্তে, প্রকৃতি আপন শক্তিবলে, আপন [illegible] দিয়া সৃষ্টি করিবে, সবাতে আপন [illegible] ফুটিয়া উঠিবে। পুরুষ শুধু দেখিবে, অনুমতি দিবে আর আনন্দ গ্রহণ করিবে। পুরুষ যেখানে নিবৃত্ত সেখানেই প্রকৃতি আপনার [illegible] খেলা [illegible], আপনাকে পরিবর্তিত করিয়া, আপনার [illegible] প্রকাশিত করিতে থাকে—[illegible]

তুমি যে দিন তোমাকে আর তোমার কর্ম্মের নিয়ন্তারূপে বোধ করিবে না, তোমার প্রকৃতির উপর সকল ভার সমর্পণ করিবে, যে দিন তুমি দেখিবে তুমি নিজে শান্ত, নির্লিপ্ত, বিশ্বপ্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার বাহিরে সব করিয়া চলিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তোমার যোগের দীক্ষা।" সেই দিন হইতে দেখিবে প্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার আধারের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া চলিয়াছে। আধারের এই পরিবর্ত্তন সাধনই সমস্ত যোগ সাধনা। তখন দেখিবে নিজে তুমি চেষ্টা করিয়া কিছু করিতেছ না, অথচ তোমার মধ্যে কত পুরাতন প্রবৃত্তি খসিয়া পড়িতেছে, কত নব নব প্রবৃত্তির উন্মেষে তোমার জীবন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের নির্লিপ্ততা—বৈরাগ্য আমি বলিতে চাই না—তোমাকে জগৎ হইতে ছাড়াইয়া লয় নাই, বরং জগতের বিরাট হইতে বিরাটতর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আধারের পরিবর্ত্তন সাধনের চারিটি স্তর। আমি বলিয়াছি উহা হইতেছে শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি। প্রথমে চাই আধারকে দোষনির্ম্মুক্ত করা, পুরাতনকে দূর করা, প্রকৃতির অন্ধ প্রবৃত্তি সমূহের খেলাকে বন্ধ করা। তাহাই হইতেছে শুদ্ধি ও মুক্তি। তৎপরে নূতনের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির জ্ঞানোদ্ভাসিত উচ্চতর প্রবৃত্তির বিকাশ ও পরিপূর্ণতা, তাহাই হইতেছে ভুক্তি ও সিদ্ধি। ক্ষেত্রটি হইতে প্রথমে আগাছা সব নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ক্ষেত্রটিকে ঝরঝরে ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। তারপর বীজবপন ও তারপর শস্যের আবির্ভাব।

এখন আধার বলিতে কি বুঝি? বুদ্ধি, মন, চিত্ত, প্রাণ ও শরীর এই পাঁচটি স্তর লইয়া জীবের আধার। এই পাঁচটি স্তরের মধ্যেই শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই তোমার পূর্ণযোগ। সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে শুদ্ধি হইতে। শুদ্ধিরও আবার আরম্ভ বুদ্ধি

হইতে। কারণ মানুষ বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিই তাহার কেন্দ্রস্থল, এ যুগে বুদ্ধির মধ্যেই সে আপনাকে স্থাপনা করিয়াছে। মানুষ বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছে সেই অনুসারেই জীবনকে ও জগৎকে গঠিত করিতে চাহে। তোমার চিন্তার গতি যেমন কার্য্যও অলক্ষিতে ক্রমে ক্রমে তদনুরূপই হইয়া পড়ে। মানবসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, বুদ্ধিরই প্রভাব তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে। বুদ্ধির উপরই মানুষকে যদি এতখানি নির্ভর করিতে হয়, তবে বুদ্ধিকে এরূপভাবে গঠিত করিতে হইবে যে তাহার উপর যেন সত্যসত্যই নির্ভর করা যায়। সকলের আগে তাই প্রয়োজন বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। বুদ্ধির দোষ কি? বুদ্ধির দোষ কূটতর্ক, বুদ্ধির দোষ কল্পনায় মায়ামরীচিকা রচনা, বুদ্ধির দোষ একদেশ-দর্শিতা। বুদ্ধি বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না—যে দিকটি সহজেই নজরে পড়ে, যাহা সহজেই বোধগম্য সেই টুকুই ধরিয়া বসে। এই খণ্ডজ্ঞানটুকুর দ্বারাই সকল বস্তু বুঝিতে চায়, এই টুকুর দ্বারাই জগৎকে পরিমাপ করিতে অগ্রসর হয়। তাহার ফলে আমরা সত্যটি হারাইয়া ফেলি, এক কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর এক প্রকার জ্ঞান আসিয়া জোর করিয়া এই সৌধটিকে না ভাঙ্গিয়া ফেলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে একমাত্র কল্পান্তস্থায়ী সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি। বুদ্ধির এই সকল দোষকেই নিরাকৃত করিতে হইবে। বুদ্ধির মুখ হইতে সেই উগ্র হিরণ্ময় পাত্রটি অপসারিত করিতে হইবে। বুদ্ধি হইবে প্রশান্ত, উদার। বুদ্ধির কাজ সৃষ্টি নয়, বুদ্ধির কাজ বুঝা। ঊর্দ্ধ-লোক হইতে যে জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে তাহাকে ধারণ করা, তাহার অর্থ গ্রহণ করা, তাহাকে যথাযথ প্রতিফলিত করা। বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানের আধার হইলে, বুদ্ধির শুদ্ধি হইলে মনের শুদ্ধি। মন হইতেছে অনুভূতির (sensation) ক্ষেত্র—পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহিরের জগতের সহিত সংস্পর্শে

আসিয়া যে রূপ রস প্রভৃতির পরিচয় পাইতেছে তাহারই আলেখ্য মন। মনের দোষ চাঞ্চল্য, বিষয়ের দাসত্ব। স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যদ্বারা যে জ্ঞানকে ধরিতে পারি না মন তাহাতে বিশ্বাস করে না, অথবা তাহার কোন খোঁজ রাখে না। পশুর যে জ্ঞান, যে চৈতন্য তাহা এই মনের জ্ঞান, মনের চৈতন্য। এই স্থূল অনুভূতিলব্ধ চিন্তাকেই মন আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিন্তা করিতেছে। মন কিন্তু কখন একটি বিষয়ের উপর অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকিতে পারে না—সর্ব্বদাই সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনকে তাই শান্ত করিতে হইবে—বহির্জগতের তাড়না অনুসারে উহাকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিও না, চিরাভ্যস্ত অনুভূতিরই দাস করিয়া রাখিও না। মন স্থির ও শান্ত হইলে শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান তাহা মনের নূতন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া দিবে, উহার দ্বারা বিষয়ের যে প্রতীতি তুমি পাইবে, তাহাই সত্য প্রতীতি। মনের পর চিত্ত। চিত্তের দুইটি স্তর। নীচের স্তরটি হইতেছে এক রকম ভাণ্ডার ঘর—মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে, চিন্তা করে, অনুভব করে তাহার সার-অংশটি ঐখানে রহিয়া যায়। মানুষের সকল রকম অভিজ্ঞারই শিকড় এই স্তরের মধ্যে। তুমি ভুলিয়া যাও বা না যাও একবার কোন রকমে যে বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ তাহার চিহ্ন এই চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মানুষ চিত্তের অন্তর্গত এই সকল সংস্কারেরই বশীভূত—ইহাদের দ্বারাই জ্ঞানে অজ্ঞানে পরিচালিত। চিত্তের শুদ্ধি অর্থ তাই এই সকল সংস্কারগত স্মৃতিকে দূর করা, একটা অন্ধ অজ্ঞানের ছায়া যে ইহাদিগকে ঘিরিয়া আছে তাহাকে অপসারিত করা। যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তন সংঘর্ষের ফলে তুমি আজ যাহা হইয়াছ তাহাই তোমার সব, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, চিত্তের যে এরূপ একটা তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক প্রেরণা আছে তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। অতীতের স্মৃতিকে ধারণ করাই চিত্তের একমাত্র কার্য্য নয়। ভবিষ্যতের

পূর্ব্বাভাবও যাহাতে চিত্তে প্রতিফলিত হয় সেই জন্য চিত্তকে উদার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। চিত্তের উপরের স্তরটি হইতেছে হৃদয়ের অনুভবের, ভাব-প্রবণতার ক্ষেত্র। যাহারই সহিত চিত্ত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, সে হৃদয়াবেগ দিয়া সেই সম্বন্ধটিকে অতিমাত্র তীব্র করিয়া তুলে। ফলে চিন্তার জগতে তুমি অধীর অসহিষ্ণু হইয়া পড়, গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি তোমার আর থাকে না। হৃদয়বৃত্তির জগতে লজ্জা ঘৃণা ভয় ক্রোধ প্রভৃতি বিকৃত-বৃত্তি তোমার সাহস বীর্য্য প্রেম প্রভৃতি সত্য-বৃত্তিকে কলুষিত আবরিত করিয়া রাখে। কর্ম্মের জগতে তোমার কর্ম্মের নিয়ামক হয় রাজসিক উত্তেজনা। চিত্তের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে হইবে—বিকার-জনিত যে ভাব তাহার পরিবর্ত্তে সত্য নিত্য ভাবকে স্থাপিত করিতে হইবে। চিত্তের শুদ্ধির পর প্রাণের শুদ্ধি। প্রাণ হইতেছে ভোগের ও কর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্র। বাসনাই ইহার প্রধান দোষ, এমন কি একমাত্র দোষ বলিলেও চলে, কারণ বাসনা হইতেই আর যাহা কিছুর উৎপত্তি। তোমার বাসনা, ইহা হইতে উহা পাইতে, কামনার ধন পাইলে তোমার হর্ষ, না পাইলে দুঃখ—শত চেষ্টার মধ্যে এইরূপে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছ। এই বাসনাকে দূর কর, কোন কিছু বাসনা করিও না, তবে তোমার চেষ্টার মত্ততাও দূর হইবে, তবেই তুমি প্রাণে সত্যশক্তি ধারণে সমর্থ হইবে, তবেই তোমার মধ্যে সত্যপ্রেরণার খেলা হইবে, সত্যপ্রেরণা তাহার তৃপ্তিকেও আপনার সঙ্গে বহিয়া আনিবে। বাসনার তিন রকম মূর্ত্তি—আসক্তি, কামনা ও রাগদ্বেষ। যখন তুমি এরূপ বোধ কর যে একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তু তোমার চাইই, না পাইলে বুঝি বিশ্ব জগৎই উল্টাইয়া যাইবে তখনই তোমার আসক্তি। আবার এরূপ উগ্রভাব দূর হইলেও, পাইবার জন্য একটা আকাঙ্খা রহিয়া যায়, সর্ব্বদাই প্রাণটি সেইদিকে পড়িয়া থাকে, ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেও সামান্য কারণেই জাগিয়া উঠে—ইহাই

হইতেছে কামনা। কামনাও দূর করিতে পারিলে থাকে তোমার রাগদ্বেষ অর্থাৎ কতকগুলি জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে তোমার সুখ বোধ হয়, আবার কতকগুলির সংস্পর্শে আসিলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর। এই রাগ-দ্বেষও দূর করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব বস্তুতে পূর্ণ সমতা পাইলে প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি। সর্ব্বশেষে হইতেছে শরীরের শুদ্ধি। রোগ জরা মৃত্যু শরীরের দোষ—শরীর ইহাদের দাস। শরীরের সংস্কার, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম-বশে তাহার রোগ হইবে, সে জরাজীর্ণ হইবে, পরিশেষে মৃত্যুর কবলে তাহার অবসান। যোগী কিন্তু জানেন স্থূল প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য নহে, তাঁহার শরীরও উহার ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র নহে। যোগীর শরীর হইবে, নিরোগ, যুবকজনোচিত স্বাস্থ্যে পূর্ণ, যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু।

আধার যদি শুদ্ধ হইল, মুক্তিও তবে উহার করায়ত্ত। মুক্তি শুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। শুদ্ধির পূর্ণতাই মুক্তি। কারণ মুক্তি অর্থ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি, আর আধারের দোষ হইতেছে এই দ্বন্দ্বের দাসত্ব। মন বুদ্ধির দ্বন্দ্ব হইতেছে সত্যাসত্য পাপ পুণ্য বোধ। তোমার সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য কি? মানুষ আপাততঃ যাহার কোন অর্থ, জগৎ ব্যাপারে যাহার কোন সামঞ্জস্য কিছু করিতে পারে নাই তাহারই নাম দিয়াছে পাপ, অসত্য ইত্যাদি। অধিকাংশ স্থলেই সুবিধা অসুবিধার মান দণ্ড দিয়া, নিজের মনগড়া এক আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সেই আদর্শ অনুযায়ী যাহা সত্য তাহাই সত্য পুণ্যকর আর সব পাপ অসত্য। যোগীর অন্য আদর্শ নাই—তাঁহার আদর্শ ভগবান স্বয়ং। ভগবান ত সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে। তোমাকে মানুষের দ্বারা স্থিরীকৃত পাপপুণ্য সত্যাসত্য বিচার করিয়া চলিতে হইবে না—চলিতে হইবে ভগবানের প্রেরণায়। ভগবান যাহা ত্যাগ করিতে বলেন তাহা ত্যাগ করিব কিন্তু অসত্য বলিয়া নয়, পাপ বলিয়া নয়, ভগবান তাহা চাহেন না বলিয়া। ভগবান যাহা গ্রহণ করিতে বলেন তাহা গ্রহণ

করিব পুণ্য বলিয়া নয় ভগবান তাহা চাহেন বলিয়া। চিত্তের দ্বন্দ্ব বোধের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রিয় অপ্রিয় বোধ, মঙ্গল অমঙ্গল বোধ, মান অপমান বোধ এ সব হইতেছে চিত্তে অহঙ্কারের ঢেউ। সুখদুঃখ, আকাঙ্খা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাণের বন্ধন আর শরীরের বন্ধন ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণ বোধ, শরীরের সুখ ও বেদনা বোধ। এ সকলের অতীত হইয়া তোমাকে শান্ত স্থিতসত্ত্ব হইতে হইবে। ত্রিগুণের খেলা হইতে যখন তুমি মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির যখন তুমি দাস নও, যখন কোন সংস্কার দ্বারাই তুমি আবদ্ধ নও, তখন তুমি স্বরাট্, মুক্ত।

যখন তুমি শুদ্ধ ও মুক্ত, চির প্রথাগত সংস্কার সমূহকে, প্রাক্তনকে যখন তুমি কাটাইয়া উঠিয়াছ তখনই আরম্ভ হইবে তোমার মধ্যে নূতনের খেলা, মানুষভাবের পরিবর্ত্তে দেবভাবের বিকাশ। তাহার আরম্ভ ভুক্তি—অর্থাৎ সমস্তখানি আধারের মধ্য দিয়া আনন্দের ক্রীড়া। আধার ক্লেদ মুক্ত, বন্ধন মুক্ত, এখন সেই নির্ম্মল আনন্দস্রোত অব্যাহত গতিতে বহমান থাকিবে। এই আনন্দ সাগর হইতেই সকল সৃষ্টি। চিন্তায় তোমার আনন্দ সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে বাক্‌যুক্ত করিয়া। মনের অনুভূতিতে আনন্দ—সকল বস্তুর, সকল ঘটনার সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের রসভোগ করিয়া। প্রেম, মৈত্রী তোমার চিত্তকে ভরিয়া দিয়াছে। যাবতীয় সুখভোগ্য পদার্থ তোমার সজীব শক্তিপূর্ণ প্রাণকে তৃপ্ত করিতেছে। শরীরও তাহার আপন আনন্দ খুঁজিয়া লইয়াছে।

যোগের শেষ হইতেছে সিদ্ধি। সিদ্ধিই যোগের লক্ষ্য, শুদ্ধি মুক্তি ভুক্তি চাই এই সিদ্ধির জন্য। আধার যখন পুরাতনকে একেবারে দূর করিয়াছে, পুরাতনেরই মত অথবা তাহা হইতেও প্রভূততর ধন রত্নে নূতনের মধ্যে আবার সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে তখনই তুমি সম্রাট, তখনই তোমার যোগসিদ্ধি।

পরিশেষে একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। আমি যে প্রথমে শুদ্ধি, তারপর মুক্তি ও সর্ব্বশেষে সিদ্ধি অথবা বুদ্ধি মন চিত্ত প্রভৃতি একটির পর আর একটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বলিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য। মনে করিও না তোমাদের যোগ এইরূপ একটির পর আর একটি শেষ করিয়া তবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। মানুষকে কখন এমনভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখা যায় না। সবগুলি ভাব সবগুলি বৃত্তি মানুষের মধ্যে এক সঙ্গে কার্য্য করে। যোগের চারিটি অঙ্গ পরস্পর সাপেক্ষ, মানুষের আধারের স্তর গুলির পরিবর্ত্তনসাধনও পরস্পর সাপেক্ষ। কোন একটি স্তর হইতে কোন একটি অঙ্গের মধ্য দিয়াই সাধনা আরম্ভ হইতে পারে কিন্তু কোন একটির পূর্ণতা আর সকল গুলির পূর্ণতার উপরই নির্ভর করে।

যৌগিক সাধন

উপক্রমণিকা

একটি মানবজীবনের বিশ্লেষণ করিলেই জগদ্‌রহস্যের আদিসূত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। জগতের যাবতীয় পদার্থের কারণ এক হইলেও মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদান, যাহার ভিতর দিয়া অনায়াসেই আমরা আদি কারণে উপনীত হইতে পারি। তাই মানবজীবন সাধনার জন্য। এই তুর্লভ জন্মলাভ করিয়া সাধনমার্গ পবিত্যাগ পূর্ব্বক পশুবৃত্তি অবলম্বন করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আমাদের বিশ্বাস এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকারী। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যে আপনাকে অপদার্থ মনে করে তাহার মত অধম আর জগতে নাই।" মানুষ অপদার্থ হইতেই পারে না। তাহার ভিতর যে দেবত্ব আছে তাহা নষ্ট হইবার নহে। আজ তুমি তোমাব অসীমত্ব, তোমার দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছ বলিয়াই তুচ্ছ কারণে আপনাকে অধম জ্ঞান করিতেছ। পরন্তু সাধন অবলম্বনে আপনার আমিত্ব উপলব্ধি কর, দেখিতে পাইবে তুমি অনন্ত শক্তির যন্ত্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি মুক্ত, তুমি অমর।

সাধারণ মানবজীবন ছাড়াইয়া, যে উপায়ে বা যে প্রণালীতে আপনার-ভিতর এই দেবভাব উপলব্ধি করা যায়, তাহাকেই যোগ বলে। অতএব

যোগ শব্দ শুনিয়াই ইহা অসম্ভব বা কঠোর কষ্টসাধ্য কিছু মনে করিয়া উপেক্ষা করিও না। এক একটা মানুষ বাসনাপরবশ হইয়া অলীক 'কাঁচা আমি'র তৃপ্তি সাধনার্থ যে সকল উৎকট কার্য্য সম্পাদন করে তাহার তুলনায় 'পাকা আমি' হইবার জন্য যে কোনও প্রকার যোগসাধন অধিকতর কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

যোগ বলিতেই অনেকে প্রাণায়াম করা মনে করেন। অধুনা দেশে মহাপুরুষগণের আগমনহেতু যে ধর্ম্মের বাতাস বহিয়াছে তাহার ফলে অনেকেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু অতীতের ধর্ম্মসংস্কার এখনও প্রভাবহীন নহে; সুতরাং ধর্ম্মসাধন করিতে হইলেই পুরাতনের আশ্রয় লইতে হয় এবং এইজন্য আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি হঠযোগের অনুষ্ঠানগুলিই যোগ, এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখা চাই, যে অতীতের আবিষ্কার অতীতের জন্য। তবে তাহার প্রভাব যে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একেবারেই বিদ্যমান না থাকিবে তাহা নহে। অতীত, জাগতিক গঠনকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবর্ত্তন হইবে, অতএব যাহা দিয়া অতীতের ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল আজও যে তাহা দিয়াই উহা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কি সম্ভব?

আমাদের সমাজ, আমাদের রাজনীতিক ক্ষেত্র, আমাদের যাহা কিছু, সকলের ভিতর এমন একটা নূতনের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার পূজা পুরাতনের উপকরণে আর চলে না। এই পরিবর্ত্তন অমঙ্গলের, একথা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবানকে ঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠেন নাই, আমরা এই কথাই বলিব। ভগবান মঙ্গলময় এবং জগতের মধ্যে পূর্ণানন্দ ভোগেচ্ছায় প্রকৃতির দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশ ঘটাইয়া মরজগতেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিবেন। যাহা ঘটিতেছে তাহা এই মঙ্গল উদ্দেশ্যেই।

অতএব যে সকল উপাদানে এবং অনুষ্ঠানে আমাদের বর্ত্তমান জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সেই প্রাচীন উপাদান এবং অনুষ্ঠান পুনরানয়ন করিলে আমাদের সমস্ত উদ্যম যে ব্যর্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

চাই একটা নূতন প্রণালী, নূতন ভাব, নূতন অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ নূতনকে বরণ করিতে যদিও সঙ্কোচ বোধ করে, তথাপি সত্য আপনি আবিষ্কৃত হয়, নূতনের মধ্য দিয়া দিয়া আপনাকে ধরা দেয়। বর্ত্তমান যুগের বিষম সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এইরূপ একটা নূতনতর সত্যের একান্ত প্রয়োজন।

যে সকল উপায় অবলম্বনে ভারতবর্ষের আজ এই পরিণতি, ভারতবর্ষকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে হইলে সেই প্রাচীন উপায় সকলই যথেষ্ট নহে। প্রাচীন উপায় দ্বারা আমাদের যাহা হইয়াছে তাহা অল্প নহে কিন্তু আমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। গাছ পুঁতিলেই ফল প্রসব করে। ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা ইহা নিশ্চয় পুরাতন সাধনারই ফল; এই অবস্থা মন্দ আমরা স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ যোগভূমি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাচীন সাধনারই সিদ্ধি স্বরূপ। অন্তর্জগতের বহু দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজ আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু তথাপি তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। তাই আজ অসম্পূর্ণতা বর্জ্জন করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে আমরা আরও কতটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি হঠযোগ সাধনে কিসের পরিণতি হয়। আমরা বুঝিয়াছি রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—আমরা বুঝিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকটাই আমাদের জীবনের খণ্ড বিকাশে সহায়তা করে। আমরা জানিয়াছি একই মানবজীবনে এগুলির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। উপলব্ধি করিয়াছি আমাদের জীবন অনন্ত, আমরা ঋষির সন্তান,

আমরা জন্ম জন্ম সাধনান্তর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখনই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান আমাদের আগমনকে এই প্রথম বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়, তখনই আমরা আমাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া যাই, পরন্তু আমরা একটা আত্মবিস্মৃত মহাজাতি।

প্রথম যখন আমরা পার্থিব ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সর্ব্বাগ্রে স্থূল শরীরের উপরই আমাদের লক্ষ্য ছিল। শীততাপ, জরামৃত্যু প্রভৃতি প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়মে আমরা বদ্ধ, এইজন্য ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন আবশ্যক হইয়াছিল এবং ইহার ফলে কঠোর হঠযোগ সাধনে আমরা শীততাপ জরা প্রভৃতির উপদ্রব হইতে আমাদের শরীরযন্ত্রকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহা করিয়াই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শরীরের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াও আমাদের জ্ঞান পরিপুষ্ট হইল না। তখন ইহারও উপরের অপর একটি যন্ত্রে দৃষ্টি পড়িল; উহা প্রাণযন্ত্র—বাসনার কর্ম্মৈষণার কেন্দ্রস্থল। উহার সূক্ষ্ম গতিবিধির পরিচয় জানিবার জন্য আবার এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া বাসনার নিবৃত্তি আসে কি না? অথবা প্রাণসংযমে সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়? ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাবিধ সাধনার সৃষ্টি হইল। বাহ্য শরীরযন্ত্রের সম্যক্ জ্ঞানলাভান্তর অভ্যন্তরস্থ এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির সন্ধান পাইবার জন্য সেএক মহাসাধনার যুগ আসিয়াছিল। উহাই তান্ত্রিক সাধনা—তান্ত্রিক সাধনার সাহায্যে প্রাণের এই অদম্য শক্তির খেলা বড় সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির জ্ঞান লাভ করিয়াও সর্ব্বানন্দ লাভ হইল না। ইহারও উপরে মানস ও চিত্ত আবেগের খেলা দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত না হইলে পূর্ণ জীবন লাভ হয় না। তাই বিষয়সংযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক

নীত হইয়া মনে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই মধুর স্পন্দনে সমস্ত জীবনটাকে রাঙাইয়া তুলে কি না, অথবা এই মনই সূক্ষ্ম প্রাণের আদি কারণ কি না বুঝিবার জন্য সাধককে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সাধনায় প্রেম বিরহ অনুরাগ আবেগ, এক একটা মনুষ্যজীবনকে জন্ম জন্ম কতবার ঘুরাইয়া লইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

পরন্তু এইখানেই যে মানুষের সর্ব্ব সাধনার পরিসমাপ্তি এরূপও নহে। ইহারও ঊর্দ্ধে বুদ্ধি বিরাজমান—তাহার অনন্ত লীলাভঙ্গী উপলব্ধি করিয়া সমস্ত মনুষ্যজীবনটার একটা সার মর্ম্ম বুঝিতে হয়। এই সার আনন্দস্বরূপের জ্ঞানেই সর্ব্বানন্দ লাভ হয়। এক একটি সাধনা পর পর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে যখন মানুষের অন্তর বাহির প্রকাশ হইয়া পড়ে, পরাজ্ঞান লাভ হয়, তখনই সে মুক্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে—আজও যদি আমাদের হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পূর্ণযোগসাধনার পথে আসিতে হয়, তবে চক্রপথে ঘূর্ণায়মান বলদের মত ক্রমাগত আমরা একই পথ পরিক্রমণ করিব। আমাদের অদ্ভুত অতীতপরায়ণতার সংস্কার আমাদের আত্মজ্ঞানের সাধনাটাকে এমন এক কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিয়াছে যে, সাধনা বলিতেই আমরা সেই অরণ্যবাসী চীরকৌপীনধারী সন্ন্যাসীর কথা মনে করি; সেই বৌদ্ধযুগকে, সেই শঙ্করযুগকে পুনরানয়নের প্রবৃত্তি আমাদের জাগিয়া উঠে।

আমরা যে নূতন সাধনার কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—ইহা অধ্যাত্মযোগ বা আত্মসমর্পণযোগ। এই আত্মসমর্পণ যোগ হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এমন কি ত্রিমার্গযোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহাই মানুষকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

১

যোগ সাধনার দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা ধারণা করিয়াছি, তাহা ভাষার সাহায্যে লিখিয়া দিতে পারা যায় এবং পাঠকও তাহা পাঠ করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সাধনা না থাকিলে যোগের তত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। খুব ধৈর্য্য সহকারে, একাগ্রচিত্তে যোগরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য একটা অটল সঙ্কল্প করা চাই ; এই সঙ্কল্প যত দৃঢ়, যত স্থায়ী হইবে, যোগের পথও ততই সুগম বোধ হইবে। ভোগবিলাসের জন্য আমরা সময়ে সময়ে যেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ি, এই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা চাই। সঙ্কল্পসাধনই যোগের প্রথম উপাদান। সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তিরই সাধনা স্বল্পায়াসে সুসিদ্ধ হয়। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই, সে অসার অপদার্থ। একটি দিনের অটল সঙ্কল্প, দেবব্রত ভীষ্মের জীবনে অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি ভারত-ইতিহাসে অমর-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়াই বলশালী বৃকোদর দুঃশাসনের রক্তপানে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঞ্চালী সঙ্কল্পসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কেশপাশ মুক্তই রাখিয়াছিলেন, সঙ্কল্প বলেই বীর জয়দ্রথকে মুণ্ডিত-মস্তক করাইয়াছিলেন, অশ্বত্থামার মাথার মণি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই সে ভোগের অধিকারীই হইতে পারে না, তা যোগ সাধনা করিবে কি প্রকারে? সংসারের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে যাহার প্রাণে একটি সঙ্কল্পেরও উদয় না হইয়াছে তাহার জীবনই বৃথা। আমি শুদ্ধ হইব, সত্যবাদী হইব, প্রাণ দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিব, এইরূপ যে কোনও একটি সঙ্কল্প যোগসাধনার ভিত্তিভূমি।

আমাদের এই অধ্যাত্মযোগগ্রহণপ্রয়াসী সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তি আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করিবেন। কেমন করিয়া, কোথায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, যোগের ধারা কি প্রকার, এই সমস্ত বিষয় এইবার বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

যোগ বলিতে সাধারণতঃ আসন, প্রাণায়াম, কুম্ভক, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপেরই আশ্রয় লইতে হয়, কেননা দেহ এবং প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক চিত্ত, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি চক্র ভেদ করিয়া সহস্রদলে উপনীত হন। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত সাধন প্রণালী হঠযোগীদের। বৈদান্তিকগণ বুদ্ধি হইতে সাধন আরম্ভ করেন। আমরা তান্ত্রিক—তন্ত্রের পথই মহৎ পথ। আর শক্তি হইতে সাধন আরম্ভ করাই প্রকৃত সত্য ও একমাত্র তন্ত্রমার্গ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ পথই জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—তাই তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমে শক্তি উপাসনা কর, শক্তিকে পাইলেই সৎকে পাইবে।" এই শক্তি উপাসনা করিতে গিয়াই, প্রচলিত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর সঙ্কল্প-পরায়ণ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানবিশিষ্ট চরিত্রবান্ ব্যক্তিই যোগসাধনার অধিকারী। এই অধিকারী না হইলে ভুল পথ অবলম্বন স্বাভাবিক। কপালে সিন্দূরের টিপ, রক্তবস্ত্রপরিহিত, যে সকল নরনারীকে প্রায়ই সমাজের ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই উক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়। ইহারা ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি সাধনা করে। হিন্দু সমাজের কত অবলা বিধবা ইহাদের কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মের নামে যে দুর্নীতির অনুসরণ করে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমি কিন্তু যে শক্তি উপাসনার কথা বলিতেছি, তাহা উক্ত আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক সাধনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের। মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পুরুষ এবং শক্তি বিদ্যমান। ঐ পুরুষই

পরমেশ্বর। ঠাকুর স্বামীজীকে এই কেন্দ্রসত্য ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখ মনে রাখিও তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই ঈশ্বর—তুমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পার, আবার নরকের কৃমিকীট হইতে পার।"

তোমার ভিতরে স্ত্রীরূপিণী শক্তি অধিষ্ঠিতা। পুরুষের ইচ্ছা হইলে, ঐ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য ভিতরে একটা শক্তি জাগিয়া উঠে এবং উহা সম্পন্ন করাই শক্তির উদ্দেশ্য।

এই ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নানা কার্য্য করিতেছ। যে শক্তির সাহায্যে তুমি কার্য্যাদি সম্পন্ন কর উহা অসীম, কিন্তু মোহগ্রস্ত বলিয়া সাধারণ জীবনে যে যোগরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইতেছে।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলি। যোগ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আমার ভিতরেই ভগবান আছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাই, বাসনা হউক, চেষ্টা হউক যে-কোন প্রকারে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে; এবং শক্তি, পুরুষের ইচ্ছা বা বাসনানুযায়ী দেহযন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছেন। মানুষ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ যোগ অভ্যাসই করিতেছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবনের প্রতি ঘটনার অন্তরালে এই শিব শক্তির খেলা দেখিয়া কৃতার্থ।

ইচ্ছা যখন বাসনার আকারে দেখা দেয়, তখন বুঝিতে হইবে জীব মোহগ্রস্ত; ভীষণ অশুদ্ধতাই ইহার কারণ। এই মোহ, এই অশুদ্ধতা, সাধন সাহায্যে বিনাশ করিয়া শুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে, বরং ইহার বিপরীত। ভগবানের বাসনা বা চেষ্টা ছিল না—তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগতের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য এই বিকাশ কার্য্যকারণ সম্বলিত, স্থান এবং কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

জগতের প্রতি ঘটনা, প্রতি বিকাশ, কল্পারম্ভে তোমার মধ্যে সুপ্ত ছিল—ভগবানের ইচ্ছায় কেবল স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে মাত্র। অতএব যাহা তুমি স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়াছ, তোমার বাসনা বা চেষ্টাদ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পার না; কেবল সাক্ষীরূপে সেই সকল পূর্ব্বকল্পিত বস্তুর শক্তি কর্ত্তৃক বিকাশ দৃষ্টিগোচর করিতে পার। মনে রাখিতে হইবে তুমি তোমারই ভগবান, ব্যক্তিগত ঈশ্বর; আর পরমেশ্বর নিখিল ভুবনের অধীশ্বর। স্থান, কাল ও অবস্থার চিন্তা তোমার পক্ষে অনাবশ্যক—সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার ভিতর দিয়া যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিলেই সমতা আসিবে, প্রতি ঘটনার ভিতর দিয়া আত্মচৈতন্য ফুটিয়া উঠিবে, বাসনা বা চেষ্টা অন্তর্দ্ধান করিবে। এই বাসনা বা চেষ্টার তিরোধান হইলেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। এই জ্ঞানোদয় একবার যদি হয়, তাহা হইলে আর বাসনা বা চেষ্টার ভয় থাকে না। এক্ষণে এই মহতী ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হও, এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া তোল। জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, জ্ঞানই প্রাণসংযম করিয়া মনের চঞ্চলতা দূর করে। ভগবদ্ ইচ্ছার প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকিলে, তোমার বাসনা বা চেষ্টা কিছুতেই থাকিতে পারে না। মনে রাখিও তুমিই ঈশ্বর, তোমাতেই শক্তি অধিষ্ঠিতা। তুমি অনুমন্তারূপে আদেশ কর, সাক্ষীস্বরূপ প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর, ভর্ত্তা হইয়া আধারযন্ত্রকে বজায় রাখিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য কর—তামসিক উদাসীনতা অথবা রাজসিক উত্তেজনায় ইহাকে ধ্বংস করিও না। তোমার ভিতর ইচ্ছারূপিণী যিনি আছেন, অজ্ঞানতাবশতঃ, যাহার স্বরূপ আপাততঃ বোধে আসিতেছে না, তিনি নিষ্কর্ম্মী নহেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেই যে জড়ত্ব আসিবে, এরূপ কল্পনা যাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সমুদিত হয়, তাহারা অহংরূপী ব্রহ্মের

উপর নিশ্চয় আস্থাবান নহেন। তুমিই জ্ঞাতা। প্রকৃতি যাহা কিছু জ্ঞেয় আহরণ করিতেছেন—তাহা গ্রহণ কর। যেরূপ বলিতেছি ঠিক এই ভাবেই জীবনের প্রতি কার্য্য সম্পাদন কর, দেখিবে তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না—সমস্তই শক্তিরূপিণী কালী করেন। ব্যস্ত হইও না, চিন্তা করিও না কিম্বা ধৈর্য্য হারাইও না—অনন্ত জীবন তোমার সম্মুখে—এত ব্যস্ততা কিসের? কেবল লক্ষ্য রাখিবে, তামসিকতায়, অলসতায় যেন জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট না হয়।

২

আমি যে দেহাতিরিক্ত আর একটা কিছু, ইহা নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে বুদ্ধিদ্বারা অধিগম্য হইলেও, সাধন সাহায্যে যেরূপ পরিস্ফুট হয়, এরূপ আর কিছুতেই সম্ভব নহে।

আমরা গীতার "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি ছন্দঃ যত জোর করিয়াই আবৃত্তি করি না কেন, বাহ্যশরীরেরই সহিত যে আমরা অধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একথা জীবনের প্রতি ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়া শরীরের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ যে ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ কথা বলি না। তবে বাহ্যাবয়বটা যে আমাদের অবিনশ্বর 'আমি'র পরিচ্ছদ, একথাটা সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে আত্মার ইচ্ছানুযায়ী অবলীলাক্রমে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে কোন দ্বন্দ্বই আসিবে না—আমাদের এইরূপ একটা অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

ইহাই আনন্দের অবস্থা। যোগসাধনায় যে সকল প্রলোভন আছে, একস্থানে দেহ রাখিয়া যথাতথা ভ্রমণ, একটি যষ্টি অবলম্বন করিয়া তদুপরি যোগাসনে উপবেশন, সমাগত ব্যক্তিবর্গকে অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শন, প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য এই যোগ প্রশস্ত নহে। অথবা ষট্‌চক্রভেদ করিয়া

ব্রহ্মে লীন হইয়া যুগযুগান্তর কাল পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান করিবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্যও এই যোগ কার্য্যকরী নহে। এই যোগে ভগবানের ইচ্ছার সহিত সাধকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর তিনি সমস্তই নির্ভর করেন। কি হইতে হইবে, কি হইতে হইবে না, এরূপ কোন কল্পনাই যোগীর অন্তরে স্থান পায় না। ভগবান্ যোগীকে যন্ত্রস্বরূপ পরিচালন করেন। যে আনন্দে আনন্দময় ক্রীড়া করেন, সেই আনন্দই জীবের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে ভুলিয়া যায় সিদ্ধি অসিদ্ধি, জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ—থাকে কেবল একটি অবিচ্ছেদ আনন্দ—সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গস্বরূপ জীব নৃত্য করিতে থাকে।

এক্ষণে এই অধ্যাত্মযোগ বুঝিতে হইলে, বাহ্যশরীর ব্যতীত সূক্ষ্মশরীরের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। কারণ, এই যোগের লক্ষ্য সমস্ত আধারের রূপান্তর—আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে পুরাতন প্রাকৃত সত্তা ও সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া অভিনব দিব্য ধর্ম্মে গড়িয়া তোলা।

মানুষ বলিতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গণ সমন্বিত একটা রক্তমাংসের মূর্ত্তিমাত্র। এই মূর্ত্তি পরিচালিত হইতেছে ভিতরের প্রেরণায়, ইহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন; এই ভিতরের যন্ত্রটী মানুষের সূক্ষ্ম-শরীর। সেটী প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। এই স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম দেহ আছে, উহা সমস্ত জড়দেহটাকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা সূক্ষ্ম হইলেও জড়দেহের সহিত ইহার সংযোগসূত্র আছে। মানব-আধারের শীর্ষদেশে ইচ্ছারূপিণী মহাশক্তি বিরাজ করেন, ইনিই এই দেহরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যোগীজন যে সহস্র-দলের কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই ইঁহার সিংহাসন, ইনিই দেবতার আদেশে, ত্রিলোকে লীলা প্রকটন করিয়া তাহার আনন্দ বিধান করেন। এই প্রকৃতিশক্তি এবং সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রকৃতি যন্ত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম-

দেহকে স্পন্দিত করেন, সূক্ষ্মশরীরে তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের মস্তিষ্ক তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমে জ্ঞান (knowledge), দ্বিতীয় বিচার বুদ্ধি (reason), এবং তন্নিম্নে বোধশক্তি (understanding) বিরাজ করিতেছে। তারপর হৃদ্‌পিণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মন প্রতিষ্ঠিত—ইহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রশক্তি। তন্নিম্নে হৃদয় হইতে নাভিতলের মধ্যে চিত্ত, নাভিতল হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম প্রাণ বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে মোটামুটি মানবদেহকে এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া হউক। ইচ্ছাশক্তি (Will of God), জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি, মন, চিত্ত ও প্রাণ—এই গুলি লইয়া সূক্ষ্মদেহ, আর স্থূলদেহ এই স্নায়ুময় এবং অন্নময় মানবশরীর অর্থাৎ রক্তমাংসময় দেহ।

মানুষ, তাহার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করে। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করিবার পথপ্রদর্শক। এক্ষণে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্য কিরূপভাবে সূক্ষ্মশরীরে উপনীত হয়, তাহা দেখা যাউক। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি কিন্তু যন্ত্রটী দেখে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন দেখে ; সে কে ? মন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন ইন্দ্রিয়গুলির বল্গা ধারণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কিছু উপরে বসিয়া আছেন। যখন বাহিরের সৌন্দর্য্য চক্ষের ভিতর দিয়া মনে পৌঁছিল, তখন মনে স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিল। এই স্পন্দনই চিত্তকে সজাগ করিয়া তুলিল—চিত্ত অমনি দৃষ্ট পদার্থটিকে আঁকিয়া বসিল। বুদ্ধির ধর্ম্ম বুঝা (to understand) ; চিত্তের রেখাপাত বুদ্ধি বুঝিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণকে উত্তেজিত করিল—দর্শন সুখ ভোগ করিবার জন্য। অনন্তর প্রাণ ভোগ করিল। মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা, প্রাণও তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীকে ইচ্ছা করিলেই চালাইয়া লয়, কার্য্য করাইয়া লয়। সূক্ষ্ম প্রাণের ভোগের অভিব্যক্তিই স্থূল শরীরে প্রকাশিত হয়।

বিষয়টী বড় জটিল। সেইজন্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। শ্যামের বাঁশী বাজিল, ফুকারিয়া ফুকারিয়া বৃন্দাবনে কানন প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রীরাধার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল তার প্রাণ"। কেন? ভোগের জন্য নহে কি? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্যামরায়ের তত্ত্বকথা শ্রীরাধার মরমে পশিল। মরম কিনা মানস-সত্তা স্পন্দিত হইল (sensation), চিত্ত রসসৃষ্টি করিয়া (emotion) বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামরায়ের অতুলনীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিল। বুদ্ধি বুঝিল এক্ষণে কিসের প্রয়োজন, সে প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল—প্রাণ স্থূল দেহযন্ত্রকে উন্মাদ করিল। শ্রীরাধা লজ্জা ঘৃণা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই বাঁশীর রব ভোগ করিবার জন্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবতার সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য ছুটিল। কেমন করিয়া মানুষ সংসাররঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছে এক্ষণে তাহার কতকটা পাঠকবর্গের ধারণা হইবে।

অতঃপর সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের যন্ত্রগুলির স্বভাব নিরূপণ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন যাহা দেখে যাহা শুনে, তাহা বুঝিয়া শরীরযন্ত্রকে পরিচালিত করে; পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয় সংযোগ হইলেই মনে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। চিত্ত, মনের স্পন্দনে দৃষ্ট পদার্থের উপর প্রেম, ঘৃণা, ভয়, লোভ উৎপাদন করে; প্রাণ, ভোগের জন্য শরীরযন্ত্রকে কার্য্য করায়। ইহাই স্বাভাবিক জীবের কার্য্য। এক্ষণে মন যদি স্বাধীনভাবে শুধু দেখিত, শুনিত; চিত্ত যদি কেবল মনের ছবি আঁকিয়া ও তদুপরি রসারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; বুদ্ধি বুঝিয়া জানিয়া নীরব হইত; প্রাণ নির্ব্বিকারচিত্তে ভোগ করিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিত—তাহা হইলে কোনই কথা থাকিত না। কিন্তু এরূপ হয় না। কাহারও কাহারও ভিতর প্রাণশক্তি এত প্রবল যে, সে চিত্ত মন ও বুদ্ধির উপর প্রভুত্ব করিতে

ব্যগ্র হয়—ফলে কোথাও কোথাও চিত্ত, মন ও বুদ্ধি প্রাণের নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হয়। প্রাণের সংস্কারগত বাসনা চরিতার্থ করাই চিত্ত, মন ও বুদ্ধির একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠে—প্রাণের প্রভাবে উহারা আপনাদের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলে। আবার কখনও মন ও বুদ্ধির উপর চিত্ত কর্তৃত্ব করিয়া থাকে—বুদ্ধি সেখানে চক্ষুহীন। চিত্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অন্ধভাবে কার্য্য করিতে থাকে। চিত্তের—প্রেম, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধের বশে বুদ্ধির বিচারশক্তি থাকে না; সে ঐ প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতির যন্ত্রপুত্তলী হয়, অকারণ হিংসা বা ক্রোধের উদয় হইলেও বুদ্ধি তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়, কেননা সে চিত্তের বশীভূত। আবার মন যদি বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন মন যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করে—দেখা শুনা দ্রব্যের বিষয় বিচার করিবার তাহার আর অধিকার থাকে না। এইরূপ বিচারবুদ্ধিও যদি জ্ঞানের কার্য্যে অন্তরায় হয়, তাহা হইলে মানুষ যুক্তি, তর্ক, কল্পনার অতীত কারণের সত্যে উপনীত হইতে পারে না। এমনকি ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতিও এই জ্ঞানের প্রখরতায় আপনাকে সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অনুদার বোধ করেন। সুতরাং কোনও মহৎ কার্য্যে মানুষ সফলতার আশা করিতে পারে না। তাহার ভিতরে যে বিপ্লব চলিয়াছে তাহার ফলে জীবন দারুণ অবসাদগ্রস্ত হয়।

এক্ষণে যোগের কি আবশ্যক? জীবশরীরের প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রকৃতিশক্তিকে অনুমন্তারূপে আদেশ করিতেছেন—উঠ, জাগ এবং এই ত্রিলোকে যে ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রশমিত করিয়া সমতা সম্পাদন কর, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। প্রকৃতি, পুরুষের আদেশমাত্র জাগ্রত হইয়া ত্রিলোকের উপর আপনার অনন্ত শক্তি সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এই সমগ্র দেহযন্ত্র ধর্ম্মসঙ্করদোষে দূষিত। ভগবানের আদেশে ইহা আজ শক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে—প্রকৃতি আমাদের যন্ত্রগুলির

ঔদ্ধত্য দূর করিয়া বশীভূত করিবেন। অতঃপর ইনি বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য নিয়োগ করিবেন, ইহার আদেশ করিবার অধিকার থাকিবে না। মন কেবল দেখিবে, শুনিবে, স্পর্শাদি অনুভব করিবে, আদেশ অথবা বিচার করিবে না। চিত্ত রসানুভবের সৃষ্টি করিবে, পরন্তু কোন আদেশাধিকার তাহার থাকিবে না। প্রাণ কেবল ভোগ করিবে, অন্য কোনও যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াস পাইবে না। প্রকৃতি এই সমস্ত সূক্ষ্মযন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া বাহ্যশরীরকে চালনা করিবেন, কার্য্য করাইবেন—শরীরের স্বতন্ত্র অহংকার থাকিবে না—ইচ্ছা, জ্ঞান, অনুভূতি, রসবোধ, ভোগ কোনও কিছুকেই সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার থাকিবে না। এই গুলিই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী স্ব স্ব কার্য্য করিবে মাত্র। প্রকৃতি, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি—স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ভগবানের যন্ত্র। ভগবানের আদেশে প্রকৃতি যন্ত্র পরিচালন করিবেন। আজ পুরুষ প্রকৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে, তাঁহার এই বিরাট সৃষ্টিযন্ত্রকে সমর্পণ করিবেন—সৃষ্টি ছাড়া আমরা নহি—অতএব আমাদেরও দেহযন্ত্র প্রকৃতির অনুগত হইবে। পুরুষের ইচ্ছায় দেহযন্ত্রের সকল কর্তৃত্ব ঘুচিয়া তাহাদের সনাতন সত্য স্বভাব পুনরাবর্ত্তন করিবে। এইজন্যই আত্মসমর্পণ যোগ। আত্মসমর্পণ করিলে ভগবানই সাধক হইয়া এই সাধনলীলা প্রকটন করেন।

৩

যোগশাস্ত্রে সূক্ষ্মদেহের যে সকল নাম আছে তাহা হইতেছে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। এই প্রাচীন শব্দগুলি সাধারণ ও সহজ করিয়া দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছা বলিব; মূলা-

ধারে অন্নময় কোষের মূল অর্থাৎ স্নায়ুময় দেহযন্ত্র, সাধিষ্ঠান হইতেছে সূক্ষ্ম-প্রাণ, মণিপুর রসস্থান চিত্ত, অনাহত মন, বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং আজ্ঞাচক্রই ইচ্ছাশক্তি। এই সকল যন্ত্র ও ইহাদের কার্য্যকলাপের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি সহস্রদলের মূল দিব্যশক্তির অনুগত হইয়া কার্য্য করিলেই যোগের সিদ্ধি।

কিন্তু প্রাণ যখন চিত্তের, চিত্ত যখন মনের, মন যখন বুদ্ধির কার্য্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখন বুঝিতে হইবে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসঙ্করদোষ নাশ না করিলে জীবের স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবন লাভ একান্ত দুরূহ।

অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন আমিই যখন ঈশ্বর, আমার ইচ্ছাতেই যখন সর্ব্ব কর্ম্ম সংসাধিত হয়, তখন এরূপ হয় কেন? ইহাই ত অজ্ঞানতা। পুরুষ স্বসৃজিত মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়া আপনার ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; তিনি ক্ষুদ্র দেহরাজ্যকেই আপনার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সহিত আপনাকে আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছেন।

শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি যন্ত্রগুলি কি ভোগ করে, না, ইহাদের ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে? ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগী কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত। এই বিস্মৃতি হইতে মুক্তির ইচ্ছা করিলেই জীবশরীরে যোগীর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইচ্ছা (Will)—বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য, মনকে বাহ্যজগতের বিষয় গ্রহণের জন্য, চিত্তকে রসসৃষ্টির জন্য, প্রাণকে ভোগের জন্য এবং দেহকে কার্য্য করিবার জন্য, পুরুষের শাসনে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।

ইচ্ছা পুরুষের। কোনও যন্ত্রের আজ্ঞাধীন ইনি নহেন। পুরুষের

সহকারিণী এই শক্তি শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু। ইনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে অপর শরীর-যন্ত্রগুলি লইয়া ক্রীডা করেন; বাসনা, ব্যগ্রতা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কোন ভাবেই ইনি আবদ্ধ নহেন। পুরুষ যাহা চাহেন, ইনি নিরাসক্তভাবে তাহাই সম্পাদন করেন।

এই শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা চাই। শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করার পর সংশয়ের জালে জড়াইয়া আবার যেন চেষ্টা ও বাসনাকে পুনঃ জাগরিত না করি, এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মৃত্যুপণ না করিলে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। শক্তির উপর অটল বিশ্বাস ঘটিলেই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন শক্তির খেলা চলিতে থাকিবে। যতদিন না এই শক্তিকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, ততদিন শরীর, প্রাণ, মন যতই চঞ্চল হউক উহার দিকে লক্ষ্য করিব না। শক্তিলাভ হইলে অর্থাৎ শক্তি অনুভূত হইলে শক্তিই সকল অন্তরায় দূর করিয়া দিবে। সাধককে প্রথমে এই শক্তি উপাসনাই করিতে হইবে।

সাধক শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে পর, শক্তি আধারের শুদ্ধিবিধানে যত্নশীলা হন। এই অবস্থায় আধার পুরাতন স্বভাব, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সহজে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়। ইহাই দ্বন্দ্বের (struggle) অবস্থা। এই অবস্থা ধৈর্য্যসহকারে কাটাইতে পারিলে, যোগের পথ অধিকতর সুগম হইয়া উঠে।

মানব-জীবন স্বভাবতঃই অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ। এই অসিদ্ধ অবস্থাই মায়াবশে জীবের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হয়। শক্তির কার্য্যের বিরুদ্ধে আধারের প্রত্যেক যন্ত্রই তাহাদের চিরদিনের স্বভাব ও সংস্কারকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাহারা বলে—আমরা মঙ্গল চাহি না, আনন্দ চাহি না, পূর্ণতা চাহি না, আমরা বেশ আছি। শক্তি কিন্তু শ্রীভগবানের পূর্ণবিকাশের জন্য অদম্য বেগে শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতির

সঙ্কীর্ণতা, অপূর্ণতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

মানুষের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া তোলাই প্রকৃতির সনাতন পদ্ধতি। তিনি মানুষকে ক্রমশঃ এই পথেই অগ্রসর করাইতেছেন ; কিন্তু সে গতির বেগ এত অল্প, যে শত বৎসর পরেও জীব, জীবনের ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যোগ এই গতিকে অত্যন্ত ক্ষিপ্র করিয়া তুলে, মুক্তির দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়—এইজন্য যোগজীবনই প্রশস্ত।

পূর্ব্বস্বভাবই যোগের পথে প্রধান অন্তরায় এবং ভগবানের ইচ্ছাই মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই ইচ্ছাকে সর্ব্বাগ্রে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই। বাসনাপরবশ আমরা স্বভাবতঃ যাহা করি, তাহার ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যোগ আরম্ভকালে, আমরা কোন্‌টি বাসনা, কোন্‌টি প্রেরণা ইহা স্থির করিতে অসমর্থ। এই অবস্থায় উপায় কি ? উপায়, যাহাই করি না কেন মনে রাখিব "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ভাল মন্দ, শুভ অশুভ যে-কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা সাধিত হউক, তাহার দায়িত্বভার আমরা কিছুতেই বহন করিব না ; এবং প্রিয় অপ্রিয় ফলভোগের প্রতিও সমানরূপে উদাসীন হইব, কেননা ভোক্তা ভগবান্‌। এইরূপ যুক্তি দ্বারা প্রথমেই আমাদের প্রাণকে বাসনাশূন্য করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত আত্মসমর্পণ মন্ত্রেরই একাগ্র সাধনবলে চিত্ত ও বুদ্ধির সমতাবিধান করিতে হইবে। চিত্তের ক্ষিপ্তৃতা, মূঢ়তাকে পরিবর্জ্জন করিব এবং বুদ্ধির কল্পনাজগতে বিচরণ বন্ধ করিয়া দিব। আমাদের মধ্যে—দেহ, প্রাণ, মন ছাড়া আর একটি যন্ত্র আছে যাহার শক্তি অপরিসীম ; তাহা হইতেছে বিজ্ঞানময়-কোষ। এই বিজ্ঞানময়-কোষ দিয়া আমরা উপরোক্ত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করি ; কিন্তু শুধু হৃদয়ঙ্গম করিলেই চলিবে না, যাহা বুঝি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহা আরম্ভ

করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্র, অসমর্থ, অনুদার—ইহা কি বাস্তবিকই সত্য? বিজ্ঞানময়-কোষ (দিব্যজ্ঞান) বলিতেছে—না, ইহাই তোমার মায়া, ইহাই তোমার অহংকার। এই মায়া, এই অহংকার ত্যাগ করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তুমি পূর্ণ, অনন্ত, উদার, বৃহৎ।

দেহের অহং, প্রাণের অহং, মনের অহং পরিহার করিলেই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি এইগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলে। তখন ভগবান্‌কে এই শরীরের দ্বারা ধারণ করা যায়, প্রাণের দ্বারা ভোগ করা যায়, মনের দ্বারা ভালবাসা যায়, বুঝিতে পারা যায় তাই মানুষের মধ্যে ধারণাসামর্থ্য, ভোগসামর্থ্য এবং প্রেমসামর্থ্য ও জ্ঞানসামর্থ্য জাগিয়া উঠে। অন্তরায়গুলিকেও জানিয়া রাখা আবশ্যক। অশুদ্ধ প্রাণ, মন, বুদ্ধিদ্বারা আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি, সেই সমস্ত অর্জ্জিত অভ্যাসের একটা প্রভাব আছে। অহংকার স্পর্শে সেগুলি মলিন এবং অপূর্ণ বটে, কিন্তু নূতনের জন্য তাহারা সহসা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হয় না।

প্রথমেই তাহারা ইচ্ছাশক্তির সহিত প্রবল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়, ক্ষেত্রস্থিত পুরাতন সংস্কার, প্রাণ মন বুদ্ধির ভিতরে ভগবৎ-শক্তিকে কার্য্য করিতে দেয় না। এই ইচ্ছাই কালীশক্তি, ইনি ভগবৎ-প্রেরণায় পুরাতনকে পরাস্ত করিয়া ধীরে ধীরে সাধকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন বুদ্ধি জাগ্রত করেন; ক্রমে সাধকের অন্তঃকরণ হইতে পুরাতন প্রস্থান করে।

প্রস্থান করিলেও, দূরে থাকিয়া অশুদ্ধ শক্তিগুলির সমবায়ে এই পুরাতন, নূতনের উপর সাধকের বিশ্বাস ও জ্ঞানকে দূর করিয়া দিবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু কালীশক্তি একবার অন্তঃকরণে স্থান পাইলে ক্রমেই প্রবল হইয়া পুরাতন স্বভাবের এই দ্বিতীয় স্তরের আক্রমণ অনায়াসেই পর্য্যুদস্ত করিয়া জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অচল করিয়া লয়েন।

স্বভাবের তৃতীয় চেষ্টা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের। কালীশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

জীবদেহে এই দেবশক্তির প্রতিষ্ঠা একদিনে সম্ভবপর নহে। জীবনের শুদ্ধিবিধানকল্পে মাতৃশক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্প যোগের প্রথম মন্ত্র। কালীশক্তির প্রবেশ কালে জীবের পুরাতন প্রকৃতির সহিত এই যে দ্বন্দ্ব উহা অতি ভীষণ। এই অবস্থাতেই ভুলভ্রান্তি, অবিশ্বাস, বাসনা কামনা, লোভ মোহ, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, বিচার আচার প্রভৃতির কুহকে জীবকে যোগভ্রষ্ট করিয়া দেয় কিন্তু এই প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যদি সাধকের মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছা একবার স্থান পায়, তাহা হইলে আর যোগভ্রষ্ট হইবার শঙ্কা থাকে না।

জীবের স্বভাব, পদে পদে অন্তরায়স্বরূপ হইয়া যেমন যোগীকে হতাশ ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, যোগের ক্রমোন্নতি তেমনি সাধককে উৎসাহ দেয় এবং আশান্বিত করে। কাল যেমন নির্দ্দিষ্ট গতির মধ্যে প্রবাহিত হয়, যোগও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ক্রমোন্নতি লাভ করে।

সাধক যোগাবলম্বনের পরেই জীবনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের আভাস পায়। পূর্ব্বে বিমূঢ় অবস্থায় প্রিয়-অপ্রিয় যে-কোন কার্য্য করিত তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তির অভাব হেতু রাগদ্বেষ কামক্রোধ উদয় হইয়া জীবকে ক্লেশ দিত, কিন্তু যোগ গ্রহণের পর যে দ্বন্দ্ব, তাহার আকার অন্যরূপ।

ইচ্ছাশক্তি জীবকে যে-ভাবে পরিচালিত করিতে চায়, ভূতাবিষ্টের মত উহা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, এইরূপ একটা ধারাবাহিক জ্ঞান ভিতরে জাগিয়া উঠে। তবুও ইহারই মধ্যে কখন সমর্থ কখন অসমর্থ, কখন উত্থান কখন পতন, কখন ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম কখন বাসনায় দাস— এমনই একটা বিপ্লবের মধ্যে, এমনই একটা আবর্ত্তনের মধ্যে, একটা দোটানার বাঁধনে যে আবদ্ধ হইয়াছি এইরূপ মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

এই দ্বন্দ্বভোগ করিতে অসমর্থ হইলে যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সাধক দ্রষ্টাস্বরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত এই অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে দেখিবে ক্রমেই পুরাতন ভালমন্দ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে, আধার যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠিতেছে—প্রাণ, মন, বুদ্ধির প্রভাব ছাড়া একটা অজ্ঞাত শক্তি জীবন অধিকার করিতেছে। যোগের এই গতি প্রাথমিক। দ্বন্দ্বের অবস্থায় ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধকের আশা ও উৎসাহ হয়।

কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইলে পথের সকল সামগ্রী যেমন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে হয়, সেইরূপ সাধনার সময় জীবনের কুসংস্কারগুলি একে একে সাধকের লক্ষ্যে আসে ও ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া থাকে। কিন্তু কালীশক্তির প্রতিষ্ঠা জীবের মধ্যে যতই দৃঢ় হয়, এই গতির বেগও ততই দ্রুততর হইতে থাকে, তখন কোথা দিয়া কি হইয়া যায় তাহা দেখিবার আর অবসর থাকে না—যেমন মটরে চড়িয়া পথ অতিবাহন করা। যোগের আরও এক প্রকার গতি আছে, তাহাতে কালীশক্তি এক মুহূর্ত্তে সকল অশুদ্ধতাকে সংহৃত করিয়া লন, সাধক তখন নিমেষেই প্রত্যক্ষ করে তাহার আধার শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলের জীবনে ইহা ঘটিয়া উঠে না, অবতার বা বিভূতিদিগের জীবনেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধককে প্রথমে এই কালীশক্তির উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই মাতৃশক্তিই যে শুদ্ধ করিয়া দিবেন, এতদ্ব্যতীত অন্য প্রয়াস বা চেষ্টা করিতে হইবে না সে বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে। পরে এই শক্তি কেমন করিয়া জীবনকে শুদ্ধ ও দেবতার আবাসস্থল করিতেছেন ধীরচিত্তে তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমি ভর্ত্তাস্বরূপ এই দেহযন্ত্রকে ধারণ করিয়া রাখিব, কালীশক্তি ইহার সর্ব্বদোষ দূর করিয়া ইহাকে অমৃতময় করিয়া তুলিবেন।

৪

শক্তির উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীবের সকল ব্যক্তিগত চেষ্টা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তখন যে-কোন ঘটনাই জীবনের উপর দিয়া হইয়া যাউক না কেন তাহাতে দেহ প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বুদ্ধি যেন কালীশক্তির উপর শ্রদ্ধাহীন না হয়। অন্যান্য আধার শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব থাকিবেই, এবং সংস্কারবশে ভালমন্দ যাহা ধারণা করিয়াছি, বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারই ব্যঞ্জনায় আধারযন্ত্রগুলি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ যোগ বুদ্ধির দ্বারা প্রথম আরম্ভ করা হইয়াছে—সুতরাং বুদ্ধি যেন কোন অবস্থায়, কোন ঘটনায়, কোন বিপদে কালী-শক্তির উপর বিশ্বাস না হারায়—সর্ব্বাবস্থা যে আমার সমগ্র আধারের শুদ্ধি-বিধানের জন্য আগত এ কথা অবিরত মনে রাখা চাই। ঘটনার পর ঘটনাই জীবনের সাধনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সমস্ত জীবনটাই যোগ।

সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, ঘৃণায় প্রশংসায় বুদ্ধি যখন স্থির হইবে, যখন বুঝিবে যে এ-সকলই মায়ের ইচ্ছা, তখনই হইবে শক্তি উপাসনার অধিকারী। মনে রাখিতে হইবে এইটুকু হইলেই সব হইল না—সিদ্ধি তখনও বহুদূর। তুমি সাধক হইলে মাত্র—মা তোমার আধারে আগমন করিলেন; অতঃপর তোমার বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন চিত্ত প্রাণ দেহ প্রভৃতির সকল আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে। এই অবস্থায় সাধককে বড়ই বিব্রত হইতে হয়। যেমন বহুশত বৎসরের ধুলিরাশিপূর্ণ কক্ষে সহসা সম্মার্জ্জনী পড়িলে চতুর্দ্দিক ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, গৃহমার্জ্জনকারীর সে ধূলায় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ আধারস্থিত কুসংস্কার ও পুতিগন্ধযুক্ত দুষ্কৃতিরাশি যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া

সাধককে মহাবিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে ; তখন কালীশক্তির উপর অকপট শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেই সকল কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধককে অদ্ভুত শক্তি প্রদান করে। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, যোগ জীবনের ভোগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেবজন্ম প্রদান করে। এই ভোগ দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধির জন্মার্জ্জিত সংস্কার ; সাধারণ জীব এই সংস্কার স্বভাববশে ধীরে ধীরে বহুজন্ম ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া যায়, যোগী যে সে সহস্র বৎসরের ভোগ এক বৎসরে অথবা এক-দিনে শেষ করিতে পারে। যাহার জীবনে এই সংস্কার ভোগ অধিক দ্রুত হইবে, তাহাকে অধিক বেগ, অধিক আঘাত সহ্য করিতে হইবে এবং অনতিকালের মধ্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু কাহার জীবনের ভোগ অধিকতর সংক্ষিপ্ত হইবে তাহা সাধকের দেখিবার আবশ্যক নাই। কালী তাহা আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন অতএব তিনি তাহার বিধান করিবেন।

এইবার কেমন করিয়া প্রত্যেক যন্ত্রটি শুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় একে একে তাহাই বলিব। প্রথমে বুদ্ধির কথা বুদ্ধি তাহার সমগ্র শক্তি দিয়া কালীকে অবলম্বন করিবে ; জীবনের উন্নতি অবনতি, ভালমন্দ, সকল ভার কালীর হস্তেই সমর্পণ করিবে, যেমন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বস্ব এই কালীশক্তিকে অর্পণ করিলাম—কালীই সর্ব্বপাপ হইতে আমায় মুক্ত করিবেন—আমার জন্য আমার আর ভাবনা নাই—এইরূপ ধারণা দৃঢ় করিতে হইবে।

এইরূপ করিলেই বুদ্ধি যুক্তি তর্ক হইতে বিরত হইবে, কল্পনাজল্পনা

প্রবৃত্তিত্যাগ, আত্মচিন্তা পূর্ব্বস্মৃতি পরিহার করিবে; বুদ্ধি হইবে স্থির শান্ত নির্থর। এইরূপে জীবের মধ্যে কালীশক্তির প্রতিষ্ঠা হইলে বুদ্ধির অহং আবরণ ভেদ করিয়া উঠিবে জ্ঞানসূর্য্য—সেই অপার্থিব পুণ্যআলোকে উদ্ভাসিত হইবে জীবের সর্ব্ব আধার। এই জ্ঞান প্রকাশ না হইলে বুঝিবে কালীশক্তির উপর বিশ্বাস এখনও দৃঢ় হয় নাই—সর্ব্বকর্ম্ম মায়ের ইচ্ছা একথা তখনও সম্যক্ ধারণ করিতে পার নাই—অতএব গুরুমুখ করিয়া আত্মসমর্পণ-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে।

জ্ঞানের লক্ষণ কি? জ্ঞানের উপকারণাদিই বা কোন্‌গুলি? তাহাদের কিরূপে ব্যবহার করিলে জ্ঞান লাভ লইবে? ইত্যাদি বিষয় এইবার বিবৃত করিব।

বুদ্ধির মুখের হিরণ্ময় পাত্রখানি উন্মুক্ত হইলেই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান তোমার ভিতরেই, কেবল অপ্রকাশ আছে মাত্র, সাধন সাহায্যে ইহা প্রকাশ হইবে। জ্ঞান প্রকাশ না হইলে সব সাধনভজন নিরর্থক। সর্ব্বাগ্রে চাই কালী, মাতৃশক্তি, চাই আদ্যাপ্রকৃতি—তার পরই চাই সত্যসূর্য্য—আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান। এ জ্ঞানমহিমা পাশ্চাত্যের মস্তিষ্কে এখনও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য জানে ক্রমাগত বহির্জগতের সম্পর্কে থাকিয়া জগতের জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, বুদ্ধিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়। আমরা বলি, জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, আত্মচৈতন্য দ্বারা আমরা জগৎকে বুঝি, জগতের আদিকারণ বিদিত হই, আপনার চৈতন্য দিয়াই বাহিরের চৈতন্য উপলব্ধি করি। আমরা জানি একই পরম ব্রহ্মে নিখিল ভূবন অধিষ্ঠিত—একই মহাকারণ হইতে উদ্ভূত সমুদয় সৃষ্টি-সংসার—সে সৃষ্টির অভিব্যক্তি আমি, তুমি, অনন্ত স্থাবর জঙ্গম, গ্রহতারা ইত্যাদি—এই কারণজ্ঞানই অনন্ত অসীম অফুরন্ত। আত্মসমর্পণযোগের প্রথম সিদ্ধি হইতেছে এই জ্ঞানলাভ।

এইখানে সৃষ্টিরহস্যের গোটা দুই কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। এই যে ধারণাতীত বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি, ইহা একদিন চিৎশক্তির কুক্ষিগত ছিল—এই আদ্যাশক্তি ইহার প্রসূতি। জ্ঞান অজ্ঞান পাপ পুণ্য, অনিল অনল, বৃক্ষগুল্মাদি যাহা কিছু সবই ভাবাকারে এইখানে অবস্থান করিত। সে তিমিরবরণা কালী গভীর আঁধারে আপনাকে ঢাকিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; সেখানে না ছিল নাম, না ছিল রূপ, না ছিল গুণ, কিন্তু ছিল এক মহাভাব যাহা অনাদিকাল ধরিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, এখনও ফুরায় নাই। এই মহাভাব লইয়া মহতের সৃষ্টি। ইহাই জগতের ছাঁচ অর্থাৎ কারণ, এইখানেই ভাব, নাম রূপ গুণ প্রাপ্ত হইল। কারণই হেতুবোধক, আদর্শ নির্ম্মল সত্য জ্ঞানময় অবস্থা। তারপর ফুটিয়া উঠিল সূক্ষ্মজগৎ, কারণের নামরূপগুণকে সম্ভবপর পরিবর্ত্তন করিয়া, রূপান্তর করিয়া বস্তুতন্ত্র করিবার পথে, ক্রমবিকাশের পথে স্থাপন করিল।

স্থূলেই সৃষ্টির প্রকৃত রূপান্তর, পরিণতি, পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ—কারণে কোনও বিকাশ নাই, কোনও বিবর্ত্তন নাই, সেথায় সকলই পূর্ণ, অবিকৃত, সনাতন। কারণই সত্য। সূক্ষ্মে সমস্তের বিকাশের জন্য আয়োজন চলে, কল্পনা জল্পনা চলে; তাই তাহা অনৃতপূর্ণ স্বপ্নবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইলেও, কারণের পূর্ণসত্য সেখানে নাই অথচ কল্পনা সেখানে বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই, স্থূলে বিকশিত হয় নাই। স্থূলে সমুদয়ের বিকাশ কিন্তু অনন্ত পূর্ণসত্যের খণ্ড বিকাশ মাত্র, তাই সেখানে ক্রমাগত অতীত আংশিক বিকাশকে অনৃতে পরিণত করিয়া ধ্বংস করিয়া, পূর্ণতর সত্য, পূর্ণতর সৃষ্টির প্রকাশ চেষ্টা চলিয়াছে।

এক্ষণে জ্ঞান অর্থে এই সৃষ্টিলীলাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা। সৃষ্টি ত্রিবিধ-স্তর-সমন্বিত বলিয়া কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই তিনটিকে আমাদের একই জ্ঞানের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দিয়া বুঝিতে হয়। স্থূল-জগৎ আমরা বুঝি

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন দিয়া, সূক্ষ্ম-জগৎ বুঝি বুদ্ধি, মেধা, বিচার সহযোগে ; কারণ-জগৎ বুঝি প্রজ্ঞার দ্বারা, প্রতিবোধের দ্বারা। এইরূপে মনের সাহায্যে স্থূল, বুদ্ধির সাহায্যে সূক্ষ্ম এবং প্রজ্ঞা দিয়া কারণতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। মন দিয়া যে জ্ঞান, উহা লইয়াই জড়-বিজ্ঞান ; বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জগৎকারণকে উপলব্ধির নামই যোগ।

সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়পথে মন দিয়া জগৎ সম্বন্ধে বাহ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে; সেই বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করে, তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বের অবধারণ করে বুদ্ধি দিয়া ; পরে জ্ঞানের রাজ্যে আরোহণ করিতে প্রয়াস পায়। যোগী কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই ভাব উপলব্ধি করে, অর্থাৎ বিষয়টীর মূলতত্ত্ব আপনার মধ্যে অনুভব করে, পরে সেই স্বানুভূতিলব্ধ ভাব সম্বন্ধে চিন্তা করে, অনন্তর সেই ভাবের অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরম্ভ করেন মন হইতে ; যোগী ঊর্দ্ধলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করেন। আজ সাধককে এই জ্ঞানক্রিয়া সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে বস্তুর ভাবকে আত্মানুভূতিগত করিয়া বিদিত হওয়া, পরে তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য বুঝিবার জন্য চিন্তা করা ; অতঃপর স্থূলের প্রকাশ সম্বন্ধে বাহ্যোপলব্ধি দ্বারা আপনার জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে ভাব, পরে চিন্তা, পরিশেষে প্রত্যক্ষ।

৫

কোনও বিষয়-বিশেষের পূর্ণ জ্ঞান লাভ কিরূপে হইবে? সর্ব্বাগ্রে সাধারণ পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা যাউক। সচরাচর জ্ঞান তিন প্রকার;

ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক। উক্ত তিন প্রকার জ্ঞানই ভ্রমাত্মক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জ্জন করি তাহা প্রমা নহে, কেন না শুক্তিতে রজত জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রতারিত হইয়া আমরা যে সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে যে-সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহারই কষ্টিপাথরে ইন্দ্রিয়সমন্বিত বিষয়-বিশেষকে মাজিয়া ঘষিয়া আলোচনা করিয়া গ্রহণ করাই যৌক্তিক জ্ঞানের কাজ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই তাহার ভিত্তিস্বরূপ এবং তাহাই তাহার প্রতিপাদ্য, সুতরাং সদোষ সসীম ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া যুক্তি তর্ক, বিষয়-বিশেষের নির্ম্মল স্বরূপ সত্যকে প্রদান করিতে পারে না। ঔপদেশিক জ্ঞানে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির সাহায্যে বুদ্ধির বিকাশ হয় মাত্র, কিন্তু তাহাও ইন্দ্রিয়াদির দাস—প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ নির্ভুল ভাবে শাস্ত্র গ্রহণ করিলে তবে ত বুদ্ধি নির্ভুল শাস্ত্রবিচার করিবে? বিশেষতঃ শাস্ত্রাধ্যয়নে শাস্ত্রের ভাষাবোধ জন্মে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মোপলব্ধি করা প্রত্যক্ষানুভবী ব্যতীত কেবল পণ্ডিতের পক্ষে অসম্ভব। অতএব যোগজ যে জ্ঞান তাহাই প্রমা, তাহাই সত্য। এই জ্ঞান, ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। উদাহরণ দ্বারা সাধারণভাবে বিষয়-বিশেষের জ্ঞানার্জ্জন এবং যোগপদ্ধতি অনুসারে বস্তুর স্বরূপ-নিরূপণ প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধরুন, আপনার রূপ দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, এক্ষেত্রে দর্শনশক্তি দিয়াই আপনার রূপ আমার অন্তরে প্রবেশলাভ করিল। তারপর আপনার বাক্য শ্রবণ-বিবরে অমৃতবর্ষণ করিল—সে কি মিষ্ট, কি মধুর; আপনার অঙ্গসৌরভে আমি উন্মাদ হইলাম—আপনার কোমল, সুঠাম দেহখানির স্পর্শলালসায় আমার সর্ব্বস্ব হর্ষভরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—আর আমি স্থির থাকিতে

পারিলাম না, দৃঢ় আলিঙ্গনে আপনাকে বদ্ধ করিলাম, আপনাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিলাম। আপনি, এই সুযোগে আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেন—হয়ত, এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়াই আপনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে আমি ত তাহা বুঝিলাম না, আপনার গুণের পরিচয় না লইয়া এইরূপ করিলাম কেন? অবশ্য বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়গুলিই ইহার কারণ। ইহাই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান।

অতএব ইন্দ্রিয়জয়ী হইলে এতটা নির্ব্বোধ হইতাম না। ভবিষ্যতে সাবধান হইলাম, মানুষ চিনিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিলাম, যে-সকল লক্ষণ দেখিলে পূর্ব্বে ভালবাসারই পরিচয় বলিয়া প্রতীতি হইত, এখন হইতে সংশয়ের চক্ষে তাহা গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তির অন্তর-বাহির না বুঝিয়া আর কাহারও নিকট ধরা দিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। ঘটনাচক্রে কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহার আকৃতি, মুখাবয়ব, তাহার উচ্চারিত প্রতিবর্ণ, তাহার হাবভাব, মনোযোগ সহকারে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। তাহার ব্যবহার কিরূপ, তাহার সঙ্গী কাহারা, কোন্ বিষয়ে তাহার অধিক আসক্তি, সে কি কথা বলে, কি কার্য্য করে, কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠে তাহার অভিরুচি ইত্যাদি নানা প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এইটুকু বাহ্য অভিজ্ঞা। অনন্তর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম—যত রকম জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে জন্মিয়াছিল সেই সকল দিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। ঠিক করিলাম, এই ধরণের লোকগুলি প্রায়ই দুষ্ট হয় অতএব তাহার সঙ্গ করা উচিত নয়, না-হয় সৎলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই যে মানুষ ভুল করিয়া থাকে, আমি এরূপ বলি না—এমন কি এতটা পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই অনেক স্থলে আমরা মনের মানুষ পাইয়া থাকি, ইহাও সত্য কথা। কিন্তু এত বিচক্ষণ-

তার পরও আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই, যাহাকে অনেকদিন ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিলাম, সেই অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মানুষ বিষয়-বিশেষের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে; মানুষ সম্বন্ধেও যেমন, কোন দ্রব্যাদির বিষয়েও তাই। প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বস্তুটিকে মনের মধ্যে লইয়া আসা হয়, পরে যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানের আলোকে উহাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তদ্বিষয়ে মিথ্যাই হউক সত্যই হউক, একটা জ্ঞান লাভ করে। বস্তুতঃ, সে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় মাত্র—কারণ তাহার সিদ্ধান্তটি ঠিক হইল কি না, এমন কি তাহার এই সমগ্র চিন্তাপ্রণালীটির মধ্যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশটুকু ছাড়া নির্ভুল ও সত্য কিছু রহিল কি না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বাহিরে যাহা কিছু, সমস্তকেই সাধারণ মানুষ সংশয়ের চক্ষে দেখে; ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যাহা সে প্রত্যক্ষ করে, অথবা সেই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যতটুকু মিল আছে, ততটুকু ছাড়া কোনও কিছুকে সে নিঃসংশয়িত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত।

কিন্তু যোগী কোন-কিছুর স্বরূপ নির্ণয় করে অন্য প্রকারে। তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সমন্বিত নহে—কোনও হেতু দর্শনে তাহার জ্ঞান আগমন করে না, বুদ্ধির এইরূপ নিরন্তর অনুশীলনের ফলে যখন প্রতিপদে বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা চক্ষে পড়িতে থাকে, যখন সে প্রতিক্ষেত্রে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে মহাশক্তির নিকট আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া নিষ্ক্রিয় হয়, শুষ্ক তৃণরাশির নিম্নে অগ্নি থাকিলে বায়ুসঞ্চারে তাহা যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, যোগীর বুদ্ধির আবরণ সহসা ভেদ করিয়া এমনই একটা প্রতিভা ফুটিয়া উঠে—তাহা নির্ম্মল, সর্ব্বাবভাসক যোগজ্ঞান।

যোগী তাহার এই অদ্ভুত প্রজ্ঞাশক্তি যে-কোন বিষয়ের উপর আরোপ করে, বিষয়টির নাম রূপ গুণ কিছুই প্রত্যক্ষ করিবার আবশ্যক হয় না, আপনার সত্তা দিয়া উক্ত দ্রব্যের সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় ; যে মহাকারণে তাঁহার আপনার প্রতিষ্ঠা, সেই একই স্বরূপের উপর যাবতীয় বস্তুর বিকাশ বলিয়া সহজেই যোগী পদার্থ বা মানুষের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া ফেলে। অবশ্য এইরূপ শক্তিলাভ অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

বিষয়টী আপাততঃ বড়ই জটিল এবং কঠিন—কারণ আমরা স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় ও বিচার বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারাই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অভ্যস্ত, এতদ্ব্যতীত আমাদের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রজ্ঞাশক্তি আছে তাহা ধারণার মধ্যে আনিতে পারি না। কিন্তু বুদ্ধি পূর্ণভাবে সেই অজানিত অনন্ত শক্তির উদ্দেশ্যে ধ্যানরত হইলে, শক্তির উপর অগাধ শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধি ও মন যখন শুদ্ধ ও শান্ত হয়—তখন প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারাই আমরা সকল কার্য্য করি। বস্তু বা কোন ব্যক্তির বাহ্য অবয়ব বা তাহার কোন আচরণ লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্মুখী ভাবের দ্বারাই তাহাদের অন্তরপ্রকৃতির পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হই।

পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইলে, এই কথাগুলি সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। কারণ-জ্ঞান জন্মিলে কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ আধারে, কারণ মধ্যস্থিত অব্যক্ত ভাবের কতটা প্রকাশ সম্ভব, তাহা ভাবের দ্বারা উপলব্ধি হইবে—মানুষের বাহির দেখিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিবার তখন আর আবশ্যক হইবে না। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে বলিব।

যোগী ঘটনাই হউক, পদার্থই হউক, মানুষই হউক, তাহার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করিতে উদ্যোগী হইলে, প্রথমেই গতানুগতিক অভ্যস্ত পন্থাটি পরিহার করিয়া বিষয়টির ভাবের সহিত আপনার ভাবকে মিলাইবার চেষ্টা

করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে ভাবিয়া লয়। প্রথমে ইহা বৃথাই বোধ হইবে। যেমন নিরক্ষর ব্যক্তি একদিনেই পুস্তকপাঠে সমর্থ হয় না, সময় লাগে, অভ্যাসযোগেও ক্রমশই ভাবের মধ্যে বস্তুটির অধ্যাত্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে—এই অধ্যাত্মতত্ত্বই কারণ, যে কারণের উপর ইহা অবস্থিত।

অনন্তর বুদ্ধির দ্বারা সেই ভাবমধ্যস্থিত অব্যক্ত জ্ঞানকে চিন্তার মধ্যে আনিতে হইবে। এই স্থানেই ভাব সম্ভবপর বিকাশপ্রাপ্ত হয়। অনুভূত অব্যক্ত জ্ঞান বাক্‌বদ্ধ হইয়া সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করে। ইহারই নাম চিন্তা। অধিকাংশ লোকেই একান্ত অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে, অসম্পূর্ণ বাক্যে, আংশিক অর্থে তাহাকে অর্দ্ধস্ফুট করে মাত্র। যোগী কিন্তু এইরূপ করে না।

তাহার চিন্তা সুপরিস্ফুট, সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত হওয়া চাই। চিন্তা না করিলেও যোগী স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু কখনও সে চিন্তা করিলে, সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ভাবেই চিন্তা করিয়া থাকে।

প্রয়োজন হইলে যোগী বিচারও করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মত নহে। সে দর্শন করে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নহে, সর্ব্বান্তর্যামীর চক্ষু দিয়া—ঐ ঐশশক্তি সম্পন্ন প্রত্যক্ষ, ঐ দৈবদৃষ্টিই তাহাকে অর্থযুক্ত ভাব প্রদান করে। এই ভাবের প্রেরণা, দেবতার প্রত্যাদেশস্বরূপ যোগীর মুখে ও লেখনীতে ভাষাকারে বহির্গত হয়—এই প্রত্যক্ষবোধই তাহাকে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত করে এবং বিবেক, ভ্রান্তি ও অসত্য হইতে সতত তাহাকে রক্ষা করে। যদি তর্ক করিতে হয়, সাধারণ তার্কিকের মত তর্কশাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থানুসারে যুক্তির পর যুক্তির প্রয়োগ করিয়া অতি কষ্টে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে যায় না। তাহার শুদ্ধ বুদ্ধিতে ভগবানই উপযুক্ত যুক্তি-পরম্পরা প্রেরণ করেন; যোগী ভগবানের সেই প্রত্যাদেশই সম্বল

এবং সুস্পষ্ট ভাবে লোক সমাজে প্রকাশ করে। সেই জন্য যোগীর কথা ক্ষুরধার সদৃশ, জীবন্ত এবং জ্বলন্ত।

যোগী কোন বিষয় না দেখিয়া কেবল ভাবমাত্র অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, ঐ বস্তুর বাহ্যবিকাশের সহিত সেই জ্ঞান মিলাইয়া লয়। এই মিলাইয়া লওয়ার জন্য কেহ যেন মনে না করেন, যে যোগী তাহার অমানুষী যোগশক্তির দ্বারা যে সঠিক জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার কোনও সংশয় আছে। যোগী কেবল মানুষের বাহ্য বিকাশে, তাহার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতার কতটুকু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই দর্শন করে। কেন না, যোগী জানে, মানুষের অন্তঃস্থিত অসীম ভাবরাশি সম্পূর্ণরূপে এককালে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। তাহার অন্তর্দৃষ্টি যে সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহারই ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে—ইহা দেখিয়া আনন্দলাভ করে মাত্র।

যোগের গতি অনুসারে যোগী অনাগত ভবিষ্যতের সকল তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের মূর্ত্তিমাত্র দর্শন না করিয়াও তাহার বিষয়ে সকল কথা বলিয়া দিতে পারে, একস্থানে বসিয়া জগতের সর্ব্বত্রে কি ঘটিতেছে, কি ঘটিবে প্রভৃতি অনায়াসে বিদিত হয়।

প্রধান কথা, মানুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের যে সম্বন্ধসূত্র আছে, বুদ্ধি ও মানসসত্তাকে স্থির করিয়া সেই মহান্ সূত্রটি অবলম্বন করিতে হইবে; সমগ্র জগতের সুর সেই সূত্রে অনাহতভাবে ধ্বনিত হইতেছে—বাহিরের কোলাহল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলেই আমরা অনায়াসেই সেই মোহন-বাঁশী শুনিতে পাইব। এক্ষণে কথা হইতেছে, এইরূপ সর্ব্বদর্শী হইবার জন্য আমাদের মনে যেন কোন বাসনা জাগিয়া না উঠে; আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহা বলা হইতেছে এ সমস্ত যোগসিদ্ধির একটা স্তর মাত্র। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, ঐ প্রকার লক্ষণ অল্পবিস্তর আমাদের চরিত্রে ফুটিয়া

উঠিবে—এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বুঝিব আমাদের যোগ কার্য্যকরী হইতেছে কি না ?

অবশেষে বক্তব্য—যোগীকে মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা মন দিয়া জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত, ভাবরূপে জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি এবং মনরূপ দ্বার দিয়া উহা প্রকাশিত হয় মাত্র। আত্মসমর্পণযোগী কালীশক্তির হস্তে সকল যন্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইলেই এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই বুদ্ধির ধারণা-সামর্থ্য জন্মিবে, খণ্ডতা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বজ্ঞানের আধার হইয়া উঠিবে।

৬

এইবার মনের কথা বলিব। যোগগ্রহণাভিলাষী সাধককে অন্তরস্থিত এই সূক্ষ্মযন্ত্রগুলিকে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। মন সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত থাকিলেও ইহা অবধারিত যে মনই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। শাস্ত্রকারগণ মনকেও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন এই ইন্দ্রিয়গুলির পশ্চাতে সর্ব্বদা না থাকিলে কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম কিছুই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয় না। এইজন্য মনকে বিশুদ্ধ করিয়া না তুলিলে আমাদের দ্বারা ভগবদ্কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

সাধকের ভিতর জ্ঞান প্রকাশ হইলেই, শক্তি মানস ক্ষেত্রে অবতরণ করে। শক্তিসাধকের ইহাই তৃতীয় অবস্থা। প্রথম, কালীশক্তিকে

আবাহন এবং তাহার উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণের সঙ্কল্প। দ্বিতীয়, কালীশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ। তৃতীয়, বুদ্ধি ও মনের অশুদ্ধতা দূর করিয়া, তাহাদিগের স্থলে জ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠিত করা।

পূর্ব্বে জ্ঞানপ্রকাশের লক্ষণ, প্রণালী প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে মন সম্বন্ধে বলিব।

সূক্ষ্মযন্ত্রগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য আমরা তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম—যথা, (১) ইচ্ছাশক্তি, (২) জ্ঞান, (৩) বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি ও (৪) মন। এস্থলে মন এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। যদিও বুদ্ধি হইতে মন ভিন্ন তথাপি তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ যদি কেবল যুক্তি, তর্ক, স্মৃতি, কল্পনা অনুমান প্রভৃতির অধীন হইত, তবে সহজেই ঐগুলি হইতে উদ্ধার পাইয়া বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া উচ্চ-জ্ঞানকেই আশ্রয় করিতে পারিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যের কল্পনা-মন্দিরে মনেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে; সেইজন্য মনকে বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে বুদ্ধিরও সম্যক্ শুদ্ধি অসম্ভব। সাধনকালে মন এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবে না ধরিয়া একই সূত্রে বদ্ধ এইরূপ ধারণা করিতে হইবে।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই লইয়াই অন্তঃকরণ। পূর্ব্বে মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিভাগে উচ্চবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের স্থান দিয়াছি। তন্নিম্ন স্তরদ্বয়—বিচারবুদ্ধি এবং বোধশক্তি—এই দুইটিই বুদ্ধি নামে অভিহিত। এই বুদ্ধি, হৃৎপদ্মস্থিত মন, তন্নিম্ন স্তরের চিত্ত এবং এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে যে অহঙ্কার—ইহারা একই সূক্ষ্মবস্তুর চতুর্বিধ বৃত্তি বা তরঙ্গ মাত্র। শাস্ত্রকারগণ কখনও কখনও এই সমষ্টিবস্তুকেই মন এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যে মন অন্তঃকরণ সমষ্টির দ্বিতীয় স্তর, তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

এক্ষণে মনের বিশেষ কার্য্যাদি প্রণিধান করিতে পারিলেই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এইগুলি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, মন অমনি ঐগুলিকে ধারণা করিয়া লয়। সুতরাং কোন বাহ্যবস্তু সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিবার এই দ্বিবিধ ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-গণ বাহ্যবস্তুকে স্পর্শ করিবামাত্র তদ্বিষয়ক একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞা মনে উপনীত হয়—এইরূপ অবস্থায় গৃহীত প্রতিবিম্ব মন হইতে নিরাকৃত হইলেও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন যখন গৃহীত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বোধ করে, অনুভব করে, ইহা এই, উহা এই, এইরূপ নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লয়—তখন বস্তুর যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান—জন্মজন্মান্তরেও তাহার ছাপ সহজে দূর হয় না।

অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না; কোন দ্রব্য নিকটবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়গণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মন কিন্তু ত্রিকালবিহারী, সে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েই বিচরণ করে। অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াশক্তি লোপ পাইতে পারে, কিন্তু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বিনষ্ট হইলে মনের ক্রিয়া ধ্বংস হয় না। মন, কল্পনার চক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া এক বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারে। চক্ষু দর্শন করিবে, কর্ণ শ্রবণ করিবে, এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, কেহই একাধিক শক্তি-সম্পন্ন নয়, মন কিন্তু এককালে সর্ব্ব রস উপভোগ করে। সপ্তবর্ণ সংযোগে যেমন বিচিত্র বর্ণ অঙ্কিত হয়, একবর্ণের কোন আলেখ্যই নয়নরঞ্জক হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ শক্তি থাকায় তাহারা বৈচিত্র্যহীন; মন কিন্তু, কোন্ পুরাকালে বাল্মীকির তপোবনে গৈরিক-বসনাবৃত লবকুশ বীণাযন্ত্রে রামগুণগান করিয়াছিল—পবিত্র তপঃক্ষেত্রের

হরিতকী আমলকী বৃক্ষের পত্রাবলী কেমন হরিত, নীল, পীতবর্ণে সুশোভিত ছিল—তপোবনের পদতল বিধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া স্রোতঃস্বিনী কেমন রজতধারায় প্রবাহিত হইত—সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের আনন্দ কলরব, বন্য বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কুজন—এইসব এককালে শ্রবণ, দর্শন কার্য্য সমাহিত হইয়া উপভোগ করিতে পারে। মনের কল্পনাশক্তি অসাধারণ। চক্ষু, যখন যে দৃশ্য সম্মুখে আইসে, তাহারই প্রতিচ্ছবি মনকে প্রদান করে, মন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য লইয়া এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব চিত্র রচনা করিয়া আপনাআপনি আনন্দ সৃষ্টি করিয়া কতকাল যে বিভোর থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যবন্ধ হইলেও মনের কল্পনালহরী অবিরত চলিতে থাকে।

মন সবজান্তা, আকাশের ঘনঘটা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারে বৃষ্টি হইবে কি না, ধূম দেখিয়া তাহার নিম্নে অগ্নি আছে একথা শপথ করিয়া বলিয়া দিবে—যদিও অনেক সময় মেঘ কাটিয়া যায়, বৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগে ধূমের সৃষ্টি হয়, কিন্তু নীচে অগ্নি থাকে না। অনেক স্থলে বোকা হইয়া গেলেও যাহা সে এতদিন ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভব করিয়া আসিয়াছে, তাহার বলেই সে ত সব বলিয়া দিবে, তারপর তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক।

মনের যে কল্পনা তাহা ঐন্দ্রিয়িক। ইন্দ্রিয়গণের স্পর্শন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির শৃঙ্খলাই মনের চিন্তা। এমন কি আমরা যখন প্রেম, সাহস, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলির কথা মনে করি, অমনি আমাদের চৈতন্যের কথা মনে পড়ে, রাণা প্রতাপ, শঙ্কর, বুদ্ধ প্রভৃতির ধারণাই জাগিয়া উঠে। যাহা দেখে যাহা শুনে তাহারই ধারণা মন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কল্পনা মনের অধিগম্য নহে।

অনেকেই বলেন, মনই চিন্তা করে কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মন,

ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক নীত বিষয় গ্রহণ করে এবং ঐ বিষয়েরই আলোচনা করে। তবে বুদ্ধি হইতে চিন্তার তরঙ্গগুলি যখন চিত্তে অবতরণ করে, তখন মন ঐগুলিকে ধরিয়া লইয়া নিজের ঐন্দ্রিয়িক কল্পনায় তাহাদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া চিত্রবিচিত্র করিয়া তুলে।

মানুষের বুদ্ধিই চিন্তাযন্ত্র। মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হয় বুদ্ধি তাহাতে সফলকাম হইতে পারে। এইজন্য পাশ্চাত্য কোনও কোনও মতে, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে যুক্তির সাহায্যে শৃঙ্খলাবিধানই যে বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা একটি গুরুতর ভ্রম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এইরূপ ঐন্দ্রিয়িক চিন্তা মনেরই কার্য্য। পশুর চিন্তা মনের অধীন—যে চিত্র, যে শব্দ সে অনুভব করিয়াছে, তাহারই বিষয় সে ভাবিতে, কল্পনা করিতে পারে। মানুষের বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্তরের—বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। যোগসাধনার দ্বারা মানুষ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে, কোনও বস্তুর সম্বন্ধে যাহা সে কখনও দেখে নাই, জানে নাই, সেই বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হইতেছে। চিন্তা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বাদীর ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা ইহাদ্বারাই যথেষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে। তাহার ঐ ধারণা প্রকৃত-পক্ষে কেবল মনের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

মনের অশুদ্ধতা—সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তদ্বিষয়ে যে ভাব গ্রহণ করে তাহা বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেয়। সাধারণ স্থলে মনই বুদ্ধিকে পরিচালিত করে, কিন্তু বুদ্ধির উপর হইতে যে সত্য ধর্ম্ম সে লাভ করে মনের এই অশুদ্ধ কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন তাহা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

আবার মনের কল্পনা সকল যে কেবল বাহ্য জগতের দর্শন স্পর্শনজনিত এরূপ নহে, পরন্তু মন বুদ্ধির চিন্তা ও চিত্তের অতীত স্মৃতিগুলিকে লুফিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের মীমাংসা করিয়া লইতে যায়। এইজন্য

যাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য অল্প তাহারা সর্ব্বতোভাবে মনেরই অধীন হইয়া পড়ে। মনের যুক্তি—সে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে তাহাই অবধারিত সত্য। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে সে সর্ব্বদাই অস্বীকার করিয়া থাকে।

সাধারণ মনের অবস্থাগুলিকে সংক্ষেপে ধারণা করা যাউক। প্রথমতঃ সে ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নীত বাহ্য-স্পর্শগুলি (sensation) সম্বন্ধে অভিজ্ঞা গ্রহণ (percept) করে; তৎপরে তাহাদের ধারণা করিতে গিয়া ইহা এই, উহা এই প্রভৃতি প্রকারের মন্তব্য সৃষ্টি করিয়া লয়, ভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে নামাঙ্কিত করিয়া লয় (Concept); দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধির যে চিন্তা এবং চিত্ত-ভাণ্ডারের যে পূর্ব্ব স্মৃতিরাশি, সেইগুলিকে লইয়া অনবরত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মিলাইয়া লয়—বাহ্যজগতের জ্ঞানের সঙ্গে যাহা মিলে না তাহা অসত্য, এইরূপ বলিয়া পরিত্যাগ করে।

এক্ষণে এই মন লইয়া যোগী কি করিবে? প্রথমেই মনকে প্রশান্ত করিতে হইবে, মনের অবিচ্ছেদ তরঙ্গমালা দমিত করিতে হইবে—মানস-ক্ষেত্র চঞ্চল থাকিলে অল্প জ্ঞানলাভ হইতে পারে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শান্ত মনই যোগীর সাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক।

কিন্তু মন যাহা ধারণা করিয়াছে, যেটুকু সে চিন্তা করে, সেগুলিকে না হয় মোছা হইল; প্রত্যুত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আনীত বিষয়স্পর্শে মনের যে খেলা তাহা নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া? আমরা ত ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সমাধির দ্বারা মনকে সর্ব্বতোভাবে শান্ত করা যায়, এইজন্যই বৈদান্তিকগণ সমাধির উপর অধিক-তর অনুরাগী—এই উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনের নিরন্তর গতি বন্ধ করা যায়।

কিন্তু যদি তুমি সমাধির দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিতে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে—সর্ব্বসঙ্গ বিরহিত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে

হইবে—জগৎ এবং ভগবান্ এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট পূর্ণচ্ছেদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই কি সত্য, স্বাভাবিক? স্বভাবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অস্বাভাবিক দুর্গমপথে যোগারোহণ করা যোগীর কর্ত্তব্য নহে, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে ভেদ না দেখিয়াই আমাদের সাধন প্রবর্ত্তন করা বিধেয়।

সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান যুগে তন্ত্রই মহৎ পথ। তান্ত্রিকরা জানে সমাধি মন স্থির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায় নহে। তান্ত্রিক তাহার অন্তঃকরণ এরূপভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, যাহাতে তাহার দর্শন, স্পর্শন, ভ্রমণ, আহার, নিদ্রা কিছুই নিরুদ্ধ করিতে হয় না, সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন এই, সকল কার্য্য যথারীতি করিতে থাকিব অথচ মন স্থির হইবে কেমন করিয়া? তান্ত্রিক তাহার মনকে যে কেবল দৃঢ়মূল ধারণা, ঐন্দ্রিয়িক কল্পনা প্রভৃতি কার্য্যতৎপরতা হইতে মুক্ত করে তাহা নহে অধিকন্তু মনের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণকারী কর্ম্মশীলতা, তাহাও বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাউক। যোগী দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে মন দিয়া নয়, বুদ্ধিসংস্থিত ইন্দ্রিয়শক্তিদি য়া; ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া জগতের সর্ব্ববিষয়ে সঞ্চরণ করিবে—মনের পরিবর্ত্তে জ্ঞানোদ্ভাসিত বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিবে মাত্র। এইরূপ হইতে থাকিলে জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুন্দরতর, সুস্পষ্টতর হইয়া উঠে; তাহাদের অতি সূক্ষ্মাংশ পর্য্যন্ত লক্ষ্যীভূত হয়; বস্তুগুলি এক দিব্য সত্য সত্তায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে সারথীরূপে দণ্ডায়মান হইলে, তখন যাহা দেখা যায় শুনা যায় তাহা কি সুন্দর, কি সুমধুর,—এক কথায় পূর্ব্বে তাহাকে এরূপ ভাবে দেখা হয় নাই, শ্রবণ করা হয় নাই। একটি পত্রের উজ্জ্বল বর্ণে,

একটি ফুলের মধুর সৌরভে, একটি পাখীর কলকাকলীতে যে আনন্দ, যে রস আস্বাদ হয়—তাহা পৃথিবীর নহে, স্বর্গের। তখন সাধক বুঝে এ পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে—এইখানেই যে লীলাময় ভগবান্ বিহার করিতেছেন—এইখানেই যে তাহার আরাধ্য, তাহার চিরবাঞ্ছিত দিব্য রত্ন তাহারই সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছেন—তখন সাধক দেখে ইন্দ্রিয়গণ অবাধ মুক্ত। এই মুক্ত ইন্দ্রিয়পথে পার্থিব সকল বস্তুর প্রতিকৃতির মধ্যে বিশ্ব আত্মার যে গুণ, যে আনন্দ, যে বিকাশ বর্ত্তমান তাহা দেখিতে পায়। এই যে বুদ্ধিস্থিত ইন্দ্রিয়ের নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌম শক্তি, ইহা যোগপথের প্রাকাম্য নামক খণ্ডসিদ্ধিরই অন্তর্গত। যোগ পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিলে দেখিবে মন আর বিরক্তির কারণ নহে, ইহা একটি মুক্ত দ্বার বিশেষ, ইহার ভিতর দিয়া বুদ্ধি চিত্তের নিকট সমাচার প্রেরণ করিতেছে, এই সমাচার লুটিয়া লইবার অসুর আর মনের মধ্যে নাই—মন শান্ত ধীরভাবে আপনার উপর দিয়া সেতুরূপে তাহা বহন করিতেছে মাত্র।

এইরূপে মনকে স্থির করিবার বহুবিধ উপায় বিদ্যমান আছে—কিন্তু সে সকলেই এই দোষটি দেখা যায় যে তদ্দ্বারা মনের যে অংশ বুদ্ধির কার্য্যানুসরণ করিয়া চিন্তা করে, তাহাকে বন্ধ করিলেও তাহার অববোধশক্তি থাকিয়া যায় অর্থাৎ মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রভুরূপে দেখিতে শুনিতে থাকে, এইজন্য মন প্রকৃষ্টরূপে স্থির হয় না, সুতরাং যোগসাধনার সম্যক্ ক্ষতি হইতে থাকে।

আত্মসমর্পণযোগে, কালীশক্তির দ্বারা এককালে জ্ঞানকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে হইবে ও মনকে স্থির করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে দুইটি সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রথমতঃ, গতানুগতিক প্রথার মত মনকে খালি করিতে হয় না, যদিও এইরূপ করা খুব ভাল কিন্তু তাহা অতীব কঠোর ও কষ্টসাধ্য তপস্যা। সহজে ধীরে ধীরে বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিবে—জ্ঞানালোকে বুদ্ধির চিন্তাকারী শক্তিকে খর্ব না করিয়া তাহাকে উচ্চচিন্তাভিমুখী করিয়া দিবে—তাহা হইলেই তাহার ক্ষুদ্রতা এবং সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া গিয়া সে দেবস্বরূপ হইবে। আর মনের কার্য্যরোধ না করিয়া তাহাকে বুদ্ধিগত বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিয়াই শুদ্ধ করিবে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণকারী শক্তিকে ধ্বংস না করিয়া প্রাকাম্য শক্তিরই ক্রিয়াশীলতা তৎস্থলে ফুটাইয়া তুলিবে। দ্বিতীয়তঃ, সুষুপ্তির মধ্যে না থাকিলে বিষয়স্পর্শ বন্ধ হয় না—চিন্তাধারা রুদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু কেবল চিন্তাশূন্য হই-লেই মন স্থির হয় না, জ্ঞানপ্রকাশ না হইলে মনের এই অনধিকার চর্চা, এই যোগপ্রতিবন্ধকতার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারা যায়? জ্ঞান উদ্দীপিত হইলেই মন নিস্তরঙ্গ হইবে, কেননা জ্ঞানালোকেই সাধক দেখিতে পায়, স্বাভাবিক বিষয়-প্রতীতিগুলি বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই প্রাকাম্য প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

৭

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মন ও বুদ্ধির শুদ্ধি অসম্ভব। মনের পরই চিত্ত সম্বন্ধে সাধকের ধারণা সুস্পষ্ট থাকা চাই।

স্বভাবতঃ চিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত। মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভোগের এবং বুদ্ধির চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি সবগুলির সঙ্গে সঙ্গে [illegible] [illegible] (Emotion) বলা হয়। [illegible]

যায়; মানুষ আবার জন্মগ্রহণ করিলে মূলাধারস্থিত ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে ফলবান হইয়া জীবকে জুড়িয়া ধরে। চিত্তের এই দুইটি ভাগের বিষয় একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

চিত্তের প্রথম যে স্তর, তাহা আবেগের ক্ষেত্র। কালীশক্তির ইচ্ছাতেই এই আবেগের সৃষ্টি। আবেগ না জন্মিলে জীবের কোন কার্য্যে উৎসাহ হয় না। বদ্ধজীব যে কার্য্য করে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে কালীশক্তির প্রেরণায় নহে—বাসনা এবং আবেগ এই দুইটি জীবকে কার্য্যক্ষেত্রে উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই আবেগ কিরূপে জীবের চিত্তে সমুৎপন্ন হইয়া কার্য্য করে।

চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থই বিশ্বজননীর হাতের যন্ত্র, তাঁহার ইচ্ছাতেই সঞ্চালিত হইতেছে—এই যে আমরা অনন্ত প্রকারের কর্ম্মসৃষ্টি করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রিয় অপ্রিয়, ভাল মন্দ নানা অভিনয় করিতেছি, ইহা কি আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না মায়ের লীলা? আমাদের ইচ্ছায় যদি আমরা একটি তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও না হয় এই বিশ্বশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির উপর আস্থাস্থাপন করিতে পারিতাম। উপনিষদের ঋষি উপাখ্যান অবলম্বনে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

> "কেনেষিতং পততি, প্রেষিতং মনঃ
> কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।"

সেই কালীশক্তির ইচ্ছাই যে আবেগরূপে জীবের চিত্তে স্পন্দনের সৃষ্টি করে, তাঁহারই ইচ্ছায় যে আমরা সকল কার্য্য করিতেছি—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যই যোগ সাধনায় আবশ্যক।

চিত্তে যে আবেগের উদয় হয়, তাহা তিন প্রকারের—ভাবের উদ্দীপনা, অনুভূতির উদ্দীপনা ও কর্ম্মের উদ্দীপনা।

প্রথম, মায়ের ইচ্ছা সহস্রদল হইতে বুদ্ধিকে ডিঙ্গাইয়া কখন কখন জীবের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া একরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করে—তাহাকেই ভাবের উদ্দীপনা বলে। কখন সহজ প্রেরণারূপে, কখন প্রত্যাদেশরূপে জীবের চিত্তে এই যে ভাবের উদ্দীপনা তাহা জীবকে কোথাও কবি কোথাও ভক্ত, কোথাও প্রতিভাবান্, কোথাও বা বিশ্বাসী করিয়া তুলে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাবোদ্দীপনা যথেষ্ট উপকারী বটে, কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহা অতি অনিষ্টপ্রদ। কেননা প্রকৃতপক্ষে কালীর ইচ্ছা হইলেও তাহা বুদ্ধির অলক্ষিতভাবে চিত্তে আসিয়া উপনীত হয়, তখন চিত্তের বহু পূর্ব্ব-স্মৃতি সংস্কার, ভাবের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং যখন বুদ্ধিতে গিয়া পুনরায় আঘাত করে, তখন নানা ভাব ও কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া বিকৃত আকারে পরিণত হয়; ফলে ঐ ভাবোদ্দীপনায় জীবের ভিতর দিয়া মায়ের অসম্পূর্ণ লীলাই প্রকাশ পায়। কিন্তু যোগী চায়—শুদ্ধ লীলা, অবিকৃত আনন্দ, পরিপূর্ণ দেবজীবন।

তারপর অনুভূতির স্পন্দন। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে আবেগ (Emotion) বলা হয়। দশ ইন্দ্রিয়কে দশ দিকে ছড়াইয়া, মন এবং বুদ্ধির যে কার্য্য তাহারই আঘাতে চিত্তে যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহাকেই অনুভূতির উদ্দীপনা বলে। এক্ষণে বুঝিতে পারিবে—মন এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কেন কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। ভাবের উদ্দীপনা যেরূপ চিত্তে আসিয়া বিকৃতদশা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ মন এবং বুদ্ধির চিন্তাও চিত্তের অশুদ্ধ আবেগে সেইরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ পায়। সেইজন্যই যোগীকে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমগ্র আধারযন্ত্রটিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

এই অনুভূতির উদ্দীপনা আবার দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য। যাহা সত্য, তাহাই নিত্য, বিকৃত যাহা তাহা অচিরস্থায়ী, অনিত্য। প্রেম সত্য জ্ঞানানুমোদিত, মানুষের বিবর্ত্তনধারায় তাহা অবিকৃত থাকে, ঘৃণা প্রেমেরই অজ্ঞানপ্রসূত বিকার মাত্র। তেজস্বিতা সত্য, ভীরুতা বিকার; পরদুঃখকাতরতা করুণা নিত্য, পরশ্রীকাতরতা নিষ্ঠুরতা অনিত্য, যাহা নিত্য তাহাই ধর্ম্ম, আর অনিত্যই অধর্ম্ম। অবশ্য যাহা বলা হইল ইহাই সনাতন আদর্শের কথা—লৌকিক অথবা সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় এখানে উল্লিখিত হয় নাই। আবার এই অনিত্য বিকারগুলিরও কিছু আবশ্যকতা আছে, কেননা বিকৃতের মধ্য দিয়াই মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর নিত্য ধর্ম্মের পথে চলিয়াছে। এই অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ই যোগীকে করিতে হইবে।

অতঃপর কর্ম্মের উদ্দীপনাগুলির কথা। সাধারণ জীব আবেগপরবশই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রেম, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি উত্তেজক বৃত্তিগুলিরই দ্যোতনায় মানুষ উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। অশুদ্ধ জীব শুদ্ধ বৃত্তির যে আস্বাদ তাহা জানে না; জীবের কামনা বাসনা না থাকিলেও যে কার্য্য করা যায়, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইবার চিত্তের দ্বিতীয় স্তরের কথা। আমরা যাহা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, বোধ করি, অনুভব করি, সেই সকলেরই ছবি এই স্তরে অঙ্কিত হয়। মরণকালে সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিকে লইয়া আমরা মহাপ্রস্থান করি। যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করি, পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবৃত্তিগুলি সংস্কাররূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কখন কখন যে সকল অন্যায় কার্য্য করি তাহা ঐ সংস্কারের ফল। যোগী, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি দর্শন করে—যোগের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি নিবীর্য্য হইয়া পড়ে।

এক্ষণে এই চিত্তকে লইয়া যোগী কি করিবে? ইহজন্মের প্রবৃত্তির উৎপীড়নেই সে ব্যতিব্যস্ত—আবার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার তাহাকে নানা মত, নানা ভাব, নানা ধারণার বশবর্ত্তী করিয়া যোগের সরল পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। যোগী যেরূপে বুদ্ধি এবং মনকে শান্ত করিবার জন্য কালীর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে, চিত্তকেও সেইরূপে দর্শনমাত্র অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। কালী যেমন বুদ্ধিকে সৃষ্টি করিয়াছেন চিন্তা করিবার জন্য, কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার জন্য নয়, চিত্তকেও সেইরূপ তাঁহার শুদ্ধ ইচ্ছার আবেগ ধারণ করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন—তাহাকে কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে হয় না, চিন্তা কিম্বা ভাবও সৃষ্টি করিতে হয় না। ভাবোচ্ছ্বাস মানুষের কার্য্যকে স্বভাবানুযায়ী রঙ্গীন তুলিকায় রঙ্গাইয়া তুলে মাত্র; মানুষ ভরিয়া উঠে প্রেমে, সাহসে, মহত্ত্বে, সত্য অভিলাষে, আত্মবিশ্বাসে—কিন্তু সেইগুলিই জীবনের কার্য্যের নিয়ামক হয় না। কোনও বিশেষ উত্তেজনায় পড়িয়া যোগী কার্য্য করে না—তাহার কর্ম্ম হয় পুরুষের ইচ্ছায়। বিজ্ঞানময় কোষ দিয়া কালীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবে মা কোন্ কার্য্যটি কেন এবং কিরূপভাবে করিতেছেন এবং চিত্ত দিয়া, হৃদয় দিয়া সেই কার্য্যকে উপযুক্ত ভাবানুপ্রাণিত করিবে। দুষ্টবুদ্ধি, আসুরী বুদ্ধি কালীর ইচ্ছাকে স্বীয় যুক্তিতর্কে যেরূপ বিকৃত করিয়া ফেলে—আসুরী চিত্তও সেইরূপ অশুদ্ধ আবেগে সেই ভগবৎ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। মায়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মা আর এইরূপ হইতে দেন না।

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছে যে মাতৃশক্তি আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে—আমাদের কামনা বাসনা, কল্পনা ভাবনা প্রভৃতি না থাকিলে তাঁহার কার্য্য পূর্ব্ববৎ বিকৃত ও দীর্ঘসূত্রীভাবে প্রকাশ না হইয়া, সুশৃঙ্খলে অবারিত দ্রুতবেগের সহিতই বিকশিত হইতে

থাকে। অন্যথা মানুষের অহংজ্ঞান এই ভগবদিচ্ছাকে বিকৃত করিয়া তোলে। আমাদের বিজ্ঞানময়কোষ হইতে ইচ্ছারূপিনী মাতৃশক্তি বুদ্ধি, মন, প্রভৃতির মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, যে যন্ত্রটির যে কার্য্য কেবল সেই কার্য্য করিলেই যোগী কালীর আদেশ লাভ করে—শুদ্ধ যোগীই এইরূপ আদেশ লাভের অধিকারী, আর যাহারা অশুদ্ধ তাহারা অহঙ্কারের দ্বারাই কর্ম্মসৃষ্টি করে, পরন্তু মনে করে ইহাই বুঝি মায়ের আদেশ।

এক্ষণে, চিত্ত যে সকল সংস্কারে সমাচ্ছন্ন থাকে তাহাকে সেইগুলি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। চিত্তের আবেগ আসিলেই কার্য্য করিবে না—পরন্তু সেই আবেগ, সেই রস-ভোগ করিবে—কার্য্য করিবে, বিজ্ঞানে যখন পুরুষের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে; সেই ইচ্ছাই তখন যন্ত্রবৎ সমস্ত পরিচালন করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চিত্তের যে রসোচ্ছ্বাস তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে না—সে যে কালীর রসলীলা—উদ্দীপনা শুদ্ধ হইলেই তাহা উদ্বেলিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে আর বিচলিত করিবে না—অগাধ সমুদ্রে তরঙ্গহিল্লোলের মত কালীর সর্ব্ববিধ ইচ্ছার আবেগ-তরঙ্গও উঠিবে, পড়িবে, নৃত্য করিবে মাত্র। যখন দেখিবে চিত্তের এই উচ্ছ্বাস কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য চঞ্চল নয়, কোন তৃপ্তিবিধানের জন্য উদ্বেলিত নয়, কেবল ভগবদিচ্ছায়, প্রেমে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, পরদুঃখকাতরতায় নৃত্যশীল মাত্র, তখনই বুঝিবে হৃদয় শুদ্ধ হইয়াছে। যখন, পরোপকার বৃত্তি জাগরিত হইবে, তাহাকে একপ্রকার আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক কিছুতেই চালিত হইবে না—যতক্ষণ না ঐ বৃত্তি ব্যতীত একটা প্রত্যাদেশ উপর হইতে লাভ হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম এই সব অসম্ভব ও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু যন্ত্রগুলির অশুদ্ধতা বিদূরিত হইলেই দেখিবে, যন্ত্রাতিরিক্ত কোন গভীর প্রদেশ হইতে মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে।

৮

প্রাণের আধার এই শরীর। প্রাণ আছে বলিয়াই রক্তমাংসের এই দেহ বিদ্যমান। প্রাণশক্তির হ্রাস হইলেই বাহ্যাবয়বও জীর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রাণের শুদ্ধি হইলেই দেহ-শুদ্ধি আপনাআপনি হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য আত্মসমর্পণযোগীকে, এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইতে হইবে।

জীবের স্থূলদেহের সহিত সূক্ষ্মদেহের সংযোগ বিধান করিয়াছে এই প্রাণশক্তি, সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্ম প্রাণের খেলা, স্থূল শরীরে প্রাণবায়ু বিবিধ স্নায়ুময় কোষে অবস্থিত থাকিয়া জীবের গতিবিধি পরিচালন করিতেছে। এই স্থূল প্রাণের কথা পরে বলিব। এক্ষণে সূক্ষ্ম প্রাণের কথাই বলি।

সূক্ষ্ম প্রাণ, মন ও চিত্তের নিম্নে নাভিতলে অবস্থিত। হঠযোগে যে চক্রের উল্লেখ আছে—ইহাই সেই স্বাধিষ্ঠান চক্র। অনেকেই সূক্ষ্ম শরীরের এই চক্রগুলিকে স্থূল-শরীরে আবিষ্কার করিতে চান। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের গ্রন্থিগুলি ঠিক ঠিক ভাবে স্থূল শরীরে পাওয়া যায় না, হঠযোগীরা কয়েকটা অনুরূপ কেন্দ্র ধরিয়া সাধন আরম্ভ করেন এইমাত্র।

সূক্ষ্ম প্রাণ বুঝিতে হইলে গোড়ার কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। চতুষ্পাদ্ আত্মার যে তুরীয় অবস্থা—অর্থাৎ যে অবস্থা আনন্দময় সত্তারও বাহিরে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে—সেই পরম ব্রহ্মের বহির্বিকাশই এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ। এই অব্যক্ত অভাবনীয় তুরীয় ভাবই অধিরোহণ করিয়াছে প্রপঞ্চ জগদ্রূপে। এই অনির্বচনীয় বিরাট ভাবই, আনন্দময় জ্ঞানময় সত্তাস্বরূপ, আত্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছে জীবের অন্তঃকরণকে—ইহাই হইতেছে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর। এই অন্তঃকরণের আবরণই আমাদের জাগ্রত বা পার্থিব শরীর। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নাই এবং জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম

নাই। সূক্ষ্মে ও স্থূলে সংযোগ হইয়াছে প্রাণময় সূত্র দিয়া—এই প্রাণ অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান্ জগৎ উপভোগ করিতেছেন।

বুদ্ধির অশুদ্ধতা যেমন জল্পনা কল্পনা, কূটতর্ক, একদেশদর্শিতা—মনের দোষ যেমন বিষয়ের দাসত্ব, বহির্জ্জগতের তাড়নায় বিক্ষিপ্ততা—চিত্তের দোষ যেমন তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক সংস্কারপন্নতা, অতীত স্মৃতিকে সদা ধারণ করিয়া সঙ্কীর্ণ বৃত্তির অধীনতা—প্রাণের তেমনি প্রধান ও একমাত্র দোষ বাসনা। এই বাসনার কুহকে আচ্ছন্ন আছি বলিয়াই অতি অনিত্য ভোগ লালসায় উন্মত্ত হইয়া জগতের প্রকৃত ভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই।

মুকুর ধূলি সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে তাহাতে মূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। প্রাণও সেইরূপ বাসনাযুক্ত থাকায় ভোগে যে ব্রহ্মানন্দ তাহা উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য প্রথমেই প্রাণ হইতে বাসনাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে নিগ্রহনীতি অবলম্বন করিয়াই অনেকে এই কামনা ত্যাগের কল্পনা করে, কিন্তু আকাশে গৃহনির্ম্মাণরূপ অসাধ্য সাধনের মত তাহাদের প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। আজ যে সকল ব্যবধানের মধ্যে আপনাকে সংস্থিত রাখিয়া বাসনার হাত এড়াইলাম, পরজন্মে সেই সমস্ত অনুকূল অবস্থা না ঘটিলে বাসনার প্রবল প্রবাহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কে বলিতে পারে? এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"।

বাসনা পরিত্যাগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আত্মপ্রকৃতির আমূল-পরিবর্ত্তনে। অন্তঃকরণকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাধকের জীবনে পুরাতনের কোন প্রভাবই যাহাতে কার্য্যকরী হইতে না পারে এমন ভাবে বুদ্ধি মন চিত্তকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল ভোগ্য বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া কামনার পরপারে চলিয়া যাইব—ইহাকে আমরা অস্থায়ী ও উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই বাসনা আমাদের কিরূপ বিভ্রান্ত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মৃত্যুর পরও জীবের মূলাধারে তাহার অতীত জন্মের সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়। নূতন জন্মগ্রহণের পরই একে একে জন্মার্জ্জিত বাসনাগুলি উঠিয়া জীবকে নাচাইতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণ—ভোগ ও কর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্র। এই ভোগ ও কর্ম্ম ভগবানের—কিন্তু ইহা উপর হইতে প্রাণে পৌঁছিবামাত্র আধারস্থিত বাসনার পুতিগন্ধে বিকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা চেষ্টারূপে, চিত্ত ও মনকে বাসনানুযায়ী বিষয়-গ্রহণের জন্য উন্মাদ করিয়া তোলে। বুদ্ধি বাসনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাম্য-পদার্থের প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মোট কথা এই, বাসনার প্রভাব বুদ্ধি হইতে স্থূলশরীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

বাসনার তিনটি রূপ। প্রথম আসক্তি, দ্বিতীয় কামনা এবং তৃতীয় রাগদ্বেষ। কোন বস্তুবিশেষের প্রতি যখন আসক্ত হওয়া যায় তখন মনে হয় ঐ বিষয় লাভ না হইলে মনুষ্য জন্ম বৃথা হইবে। সুতরাং ঐ বস্তু লাভ করিবার জন্য মন বুদ্ধি সমস্তই নিয়োগ করিয়া দিবারাত্র চেষ্টা করিতে হয়। অভীষ্টসিদ্ধ হইলে ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত, আর বিফল হইলে রাগে অভিমানে মৃতপ্রায় হইয়া কেবলই সেই চিন্তা, কেমন করিয়া হইবে—যে রকমেই হউক লাভ করা চাই। কোন প্রকারে প্রাণের এইরূপ আসক্তির উগ্রতা দূর হইয়া যাইলেও উক্ত দ্রব্যটি লাভ করিবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে থাকিয়া যায়। কখন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তৎক্ষণাৎ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়—ইহাই কামনার খেলা।

কামনা দূর হইয়া যাইলেও, রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। জন্মজন্মান্তরের বাঞ্ছিত জিনিষগুলিতে যেমন আনন্দ আছে, আবার যেগুলি ভাল লাগে না সেইগুলিতেও সেইরূপ উৎকট বিরাগ। এই রাগদ্বেষ তিরোহিত

হইলেই জীবের মধ্যে সমতা দেখা দেয়। ইহাই প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি।

এক্ষণে এই প্রাণকে কি করিয়া বাসনামুক্ত করা যায়? সাধক কালী-শক্তিদ্বারা বুদ্ধিকে বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তুলিবে—বাসনা যেন বুদ্ধিকে কোন মতে বিভ্রান্ত করিয়া না তোলে। তাহার পর মনকে শান্ত ও চিত্ত যাহাতে অচঞ্চল থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে বাসনা কেবল প্রাণগত হইয়া পড়িবে—সেইখানেই সে উঠিবে পড়িবে পরন্তু মন ও বুদ্ধিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

এরূপ অবস্থায় অন্তঃকরণে পূর্ণ শান্তি সম্ভবে না, কেননা বাসনা প্রাণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তির জন্য ক্রমাগত চিত্তে মনে আঘাত করিতে থাকে, কিন্তু একবার যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযোগে এই সকল যন্ত্র হইতে বাসনার প্রভাব দূর করিয়া তাহাকে প্রাণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেননা চিত্ত ও বুদ্ধির সহায়তা না পাইলে বাসনা কার্য্যকরী হয় না। যদি এই বাসনা কোন ক্রমে জীবের অন্তরে একটা আদর্শ বা জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা হইলে তাহার শক্তি দমন করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য ভালমন্দ যে কোন বাসনাই হউক না কেন কখন বাসনার আবেগে অভিভূত হইবে না।

অনেকেই বলেন ভাল বাসনাগুলি রাখিয়া মন্দগুলি বিসর্জ্জন দিতে। এই সকল লোকের উপদেশসমূহে কখনই কর্ণপাত করিবে না। তবে এই-রূপ সঙ্কল্প করিতে পারা যায়, যে মন্দ বাসনাগুলিকে ত্যাগ করিবার জন্য উপস্থিত ভাল বাসনাগুলিকে রাখা হইতেছে, পরে মুমুক্ষুত্ব এবং ভগবানের সহিত মিলনের বাসনামাত্র রাখিয়া সেগুলিও ত্যাগ করা হইবে। পরিশেষে ভগবানের হস্তে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিলে হইবে নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার। নতুবা ভালর ছদ্মবেশে মন্দ বাসনা প্রাণের মধ্যে বাস করিয়া এমন ভীষণ অবস্থায় নিক্ষেপ করে যে সেখান হইতে উঠিবার সামর্থ্য আর থাকে না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে পাপ পুণ্য উভয়েরই অতীত হইবার সঙ্কল্প।

বাসনা যখন প্রাণের সীমাবদ্ধ গতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া হাহাকার করিতে থাকে তখন তাহার করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবে না—সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবদ্ চিন্তায় মন ও বুদ্ধি সংযোগ করিবে। এই-রূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই দেখিবে আসক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে শক্তি নাই। আসক্তি শক্তিহীন হইলেই কামনা একেবারে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে—তখন অনায়াসেই আসক্তি ও কামনাকে চিরতরে দূর করিয়া দেওয়া যায়। আসক্তি এবং কামনার নাশ হইলেও রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কামনা না থাকায় জীবনের উপর যাহা আসে তাহা সুখ দুঃখ যুক্ত হইলেও সাধক নির্ব্বিকার চিত্তে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে—সুখে এবং দুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনাতেই ভগবানের হস্ত অনুভব করিতে করিতে সাধক সমতা ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী যে ভগবানেরই ভোগ ভূমি, এই শুদ্ধ ভোগের সহিত পূর্ণ শান্তি বিরাজমান—পূর্ণ সমতা লাভ করিলেই সাধক তাহার আস্বাদ পাইবে। অনেকের ধারণা, কামনা না থাকিলে ভোগ সম্ভবে না—ইহা নিতান্তই অজ্ঞতা—কামনার কুহকে প্রাণ আচ্ছন্ন থাকিলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না, আর জ্ঞান বিকাশ না হইলে ভোগের আস্বাদ করিবে কে? সত্যসত্যই কামনামুক্ত না হইলে ভোগ আরম্ভই হয় না। কামনার তাড়নায় যে ভোগ, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্লেশদায়ক, শঙ্কাবিজড়িত, সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রাণের যে ভোগ তাহা শান্ত, অফুরন্ত, পরমানন্দদায়ক। সেই "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"র মত, তৃপ্তি ও বৈরাগ্য বিবর্জ্জিত অমরার মহামৃত। ইহা হর্ষ বা সুখ নহে—ইহা আনন্দ—এই অমৃত পানে সাধক জন্মমরণ শূন্য হইয়া ভগবদ্ প্রকৃতি লাভ করে।

কাম যখন শুদ্ধ লিপ্সায় পরিণত হয় তখন সাধক জগতের যাবতীয় পদার্থই শিবের মত নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা ভগবানের দান বলিয়া সাধক সমস্তই আনন্দ রূপে গ্রহণ করে।

এই পূর্ণযোগীর আত্মা যদি অনন্ত নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানেও তাহার অবিচল পূর্ণ শান্তির অন্ত হয় না—ভক্তের মত কেবল ভগবানের ইচ্ছা বলিয়াই সে পরিতৃপ্ত হয় না—সে পরম জ্ঞানীর মত, নরক কুণ্ডকেও আলিঙ্গন করিয়া বলিতে থাকে, "ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার ভগবান্, আনন্দময় ব্রহ্ম—আমার শিবম্ শুভম্ সুন্দরম্।"

৯

এইবার আমি স্থূল শরীরের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সংযোগে প্রাণশক্তি এই রক্তমাংসের শরীর যদৃচ্ছা পরিচালন করিতেছে। এই অন্নময় শরীরের কেন্দ্রস্থান মূলাধার পদ্মে; ইহারই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নাভিতলের নিম্নে সূক্ষ্মপ্রাণ বিরাজ করিতেছে—স্থূল ও সূক্ষ্মের ইহাই মিলনকেন্দ্র। প্রাণবায়ুর বন্ধনে সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের সহিত আবদ্ধ, এই সূক্ষ্ম দেহ প্রাণবায়ু সংহৃত করিয়া প্রস্থান করিলে মানুষের মৃত্যু হয়—তখন অপান বায়ুমাত্র থাকিয়া জীবদেহের বিকৃতি উৎপাদন করে। একই বায়ু জীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য করে; প্রাণবায়ুর কার্য্য সূক্ষ্মদেহানুরূপ শরীর রক্ষা করা, তাই সূক্ষ্মদেহের অবর্ত্তমানে শরীরের শৃঙ্খলা থাকে না—অনন্ত কোটী জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া দেহ রূপান্তরিত হয়। আমি এ পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের শুদ্ধি বিধানের কথাই বলিয়া আসিয়াছি—মানুষের সূক্ষ্মদেহ কি? তাঁহার অন্তঃকরণ—এই অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলাই এই যোগের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। শরীর কিছুই নহে,

সূক্ষ্মদেহেরই ছাঁচ বিশেষ, মনই এই শরীরকে গড়িয়া তোলে, মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মন যদি মুক্ত ও শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই শরীরও শুদ্ধ এবং মুক্ত হইয়া উঠে, মানসিক অশুদ্ধতা নিবন্ধনই আমরা শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু প্রভৃতি ভীষণ দ্বন্দ্ব ভোগ করি। সাধন সাহায্যে আমাদের মন যখন অতীত সংস্কার হইতে মুক্ত হয়, মায়ার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলে, তখন জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মভোগ সবেগে শরীরের উপর পতিত হয়। সাধক তখন ইচ্ছা করিয়াই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই কর্ম্মফল শরীর দিয়া ভোগ করিতে থাকে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দৈবিক, ভৌতিক যতবিধ নির্য্যাতন থাকিতে পারে সমস্তই শরীরের উপর ভোগ হইতে থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধকের মন ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আবার নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে মনের সর্ব্ববিধ অশুদ্ধতা শরীরের উপর ন্যস্ত হইলে, সাধক সেই অন্নময় কোষ হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারে, এরূপ অবস্থায় সাধক কায়া শুদ্ধি ও কায়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে—হঠযোগ ও রাজযোগীদের প্রণালীই এ ক্ষেত্রে অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু আমরা যে আত্মসমর্পণ যোগের কথা বলিতেছি, তাহা উক্ত প্রকার সাধন প্রণালী অপেক্ষা সরল ও সহজসাধ্য এবং নিশ্চয়ই সিদ্ধিপ্রদ। যদি তুমি মনকে শুদ্ধ করিতে পার, স্বভাবতই তোমার শরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; যাহার মন পৃথিবীর পাপ হইতে মুক্ত, স্বাধীন তাহার শরীরও অসাধারণ শক্তি-সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃকরণের উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে, নিশ্চয়ই তোমার শরীর উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান কালে শরীরের উপর অযথা অত্যাচার করিবে না—মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে শরীরের সকল দোষ বিদূরিত হয় না—শরীর

যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যেন শরীরের সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই—যতটা পার, ইহা শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শক্তির হস্তে যন্ত্র-স্বরূপ এইরূপ ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। অধিকাংশ সাধক এই অব-স্থায় শরীরের চিন্তায় আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, কিন্তু তাহা উচিত নয়—ভগ-বানের হস্তে এ শরীর দিয়াছ এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হইবে, যত উৎকট ব্যাধিই হউক না কেন, বিন্দুমাত্র ভীত হইও না—তাহা যে শরীরের অশু-দ্ধতা, এবং এই অশুদ্ধি বহিষ্কৃত হইয়া গেলে শুদ্ধি আসিবে এইরূপ মনে করিবে। কেননা, বহু কুসংস্কারপূর্ণ জীর্ণ আধার যন্ত্রটিকে ভগবানের কার্য্যোপযোগী করিতে তাহার বহু পরিবর্ত্তন আবশ্যক—সমগ্র নাড়ীযন্ত্র, মস্তিষ্ককোষ, পরিপাকরস-নিঃস্রবণকারী যন্ত্রগুলির আমূল পরিবর্ত্তন আব-শ্যক—এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য নানাবিধ শারীরিক অসুবিধা কিছু কিছু ভোগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির জানিও। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতার সময় যদি একান্তই অধীর হইয়া পড় এবং ইহার প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া যদি নিতান্তই ঔষধাদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে যতটা পার খুব সামান্য নির্দ্দোষ ঔষধাদি সেবন করিবে। ব্যাধি দূর করিতে গিয়া উগ্রভাবে শরী-রের উপর নূতন অত্যাচার করিও না—মনে রাখিও, "You cannot care more for yourself, than God cares for you"—ভগবান্ তোমার জন্য যেরূপ যত্ন লন তুমি কদাচ নিজের জন্য সেরূপ লইতে পার না। তোমার চেষ্টা তোমায় বিপথেই পরিচালিত করিবে—ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি মঙ্গল এবং শুভের পথেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন—সাধকের এইটুকু আস্থা না থাকিলে তাহার পক্ষে যোগসাধনা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

শরীরের দোষ ও গুণ সবিশেষ জানিতে হইলে হঠযোগ কথিত শরীরতত্ত্ব

বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই; তবে মোটামুটি শরীরের অশুদ্ধতা জরা, শীতোষ্ণে সুখ দুঃখ বোধ, মলমূত্র প্রভৃতি আবেগের অধীনতা। একটি পদ্মপত্রে যেমন অসংখ্য শিরা সুবিন্যস্ত, সেইরূপ আমাদের শরীর গণনাতীত সূক্ষ্ম স্থূল শিরা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ঈড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নাড়ীই সর্ব্ব-প্রধান এবং প্রাণ, অপান প্রভৃতি দশবিধ বায়ু এই নাড়ীসমূহে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া আমাদের বাহ্যাবয়বকে সঞ্চালিত করিতেছে। যেমন একই ব্রহ্ম নিখিল ভুবনে বহু বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভব করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুর অহংপরবশ হেতু পরস্পর হইতে ভিন্নবোধ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াই-য়াছে—সেইরূপ একই বায়ু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সংসাধনে রত থাকিয়া তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। হঠযোগদ্বারা সমগ্র বায়ুর কার্য্য একই প্রাণবায়ুর সাহায্যে সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণের ইচ্ছামত সমস্ত শরীর যন্ত্রটীকে পরিচালিত করা অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই অবস্থায় শরীরের শুদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে, সাধক ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার ব্যাধির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে—শীতোষ্ণে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্বভোগ করিতে হয় না—মলমূত্র ত্যাগের আর আবশ্যক হয় না, এমন কি কেবল বায়ু আহার করিয়াই অতি দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইচ্ছামাত্র সাধক আপনার শরীরকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিতে পারে, আবার সূচের মত সূক্ষ্মশরীরও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, লৌহের মত গুরু এবং তুলার মত লঘু হইয়া আকাশে পরিভ্রমণও করিতে পারে, ইহাই অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। কলিযুগে এরূপ অবস্থা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তবে ইহা একান্তই অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবারও কোন কারণ নাই।

আমরা যে যোগ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত উপরে কথিত হঠযোগের কোনই সম্পর্ক নাই, আমরা অন্তঃকরণকেই সর্ব্বপ্রথমে

বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই, পাশ্চাত্য জাতিগণের মতে শরীরের স্বচ্ছন্দতাই মানসিক উন্নতির একমাত্র কারণ আমরা ইহা স্বীকার করি না। শরীরের অনুগত মন, এই ধারণা মানুষের মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া দিতে হইবে—আমরা শুদ্ধ মনের দ্বারাই দেবশরীর গঠন করিয়া তুলিতে চাই। মনই শরীরকে চালিত করিবে, শরীরের অবস্থান্তর মনের দ্বারাই ঘটিয়া উঠিবে, এমন কি জগতের যে নিয়ম মৃত্যু তাহাও যোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে তাই যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু। সেইজন্য সাধকের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা কেন্দ্রগত হইবে অন্তঃকরণের উপর—এই অন্তঃকরণের পূর্ণ বিকাশের উপরেই বহির্জগতের উন্নতি-নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে মানুষ হইতেছে বুদ্ধিজীবি, চিত্ত মন প্রাণ শরীর এই সমস্ত বুদ্ধিরই অধীন এবং বুদ্ধিদ্বারাই ইহাদের উন্নতি অবনতি ঘটিতেছে। এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের নূতন যোগ প্রচার করিতে চাই। বুদ্ধির স্বভাবতঃ নিম্নগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাহার সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতে চাই কালীশক্তিকে বুঝিবার জন্য, তারপর এই কালীশক্তির করুণা-বলেই বুদ্ধির মুখের তীব্র উজ্জ্বল আবরণটিকে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিতে চাই এবং তাহারই আলোকে বুঝিতে চাই —আমরা কে? যখন আমরা অনন্ত কালীশক্তির যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহি এইরূপ বুঝিব তখন অন্ধের মৃত্যুর বোঝা কালের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া মুক্ত পুরুষের মত বলিয়া উঠিব—আমরা মুক্ত, আমরা শুদ্ধ, আমরা সিদ্ধ।